মে ২০১৯ ▪ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬

সচিত্র বাংলাদেশ

সতেরোই মে
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

নজরুলের কবিতায় নারী

শ্রমিকের অধিকার ও
প্রাসঙ্গিক ভাবনা

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

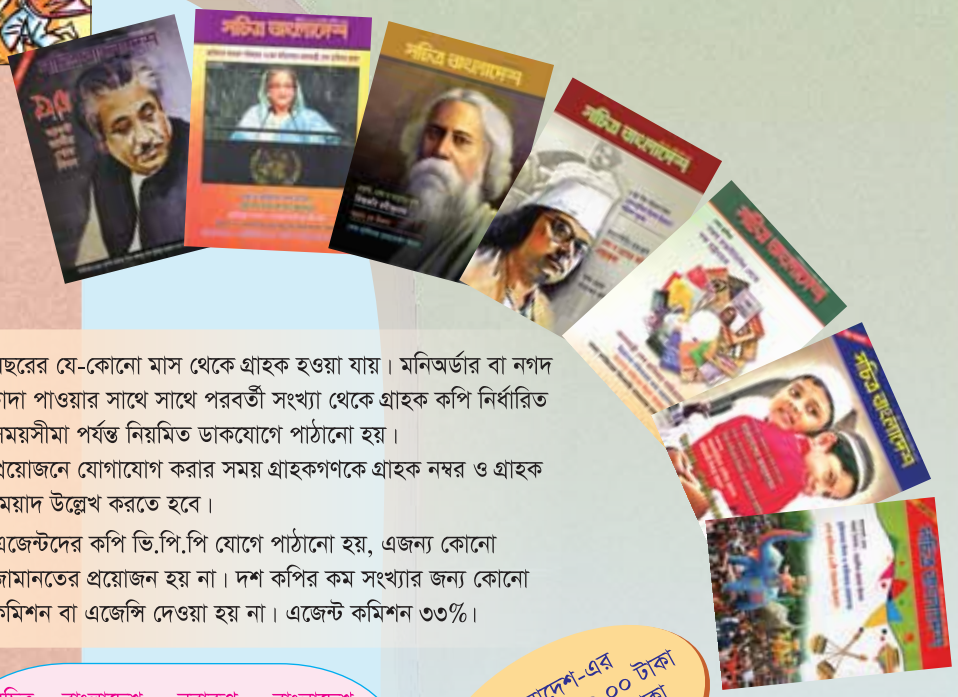

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ
মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই ০১৫৩১৩৮৫১৭৫ বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 39, No. 11, May 2019, Tk. 25.00

মাতৃ কোলে পরম আদরে শিশু

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

মে ২০১৯ ❑ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬

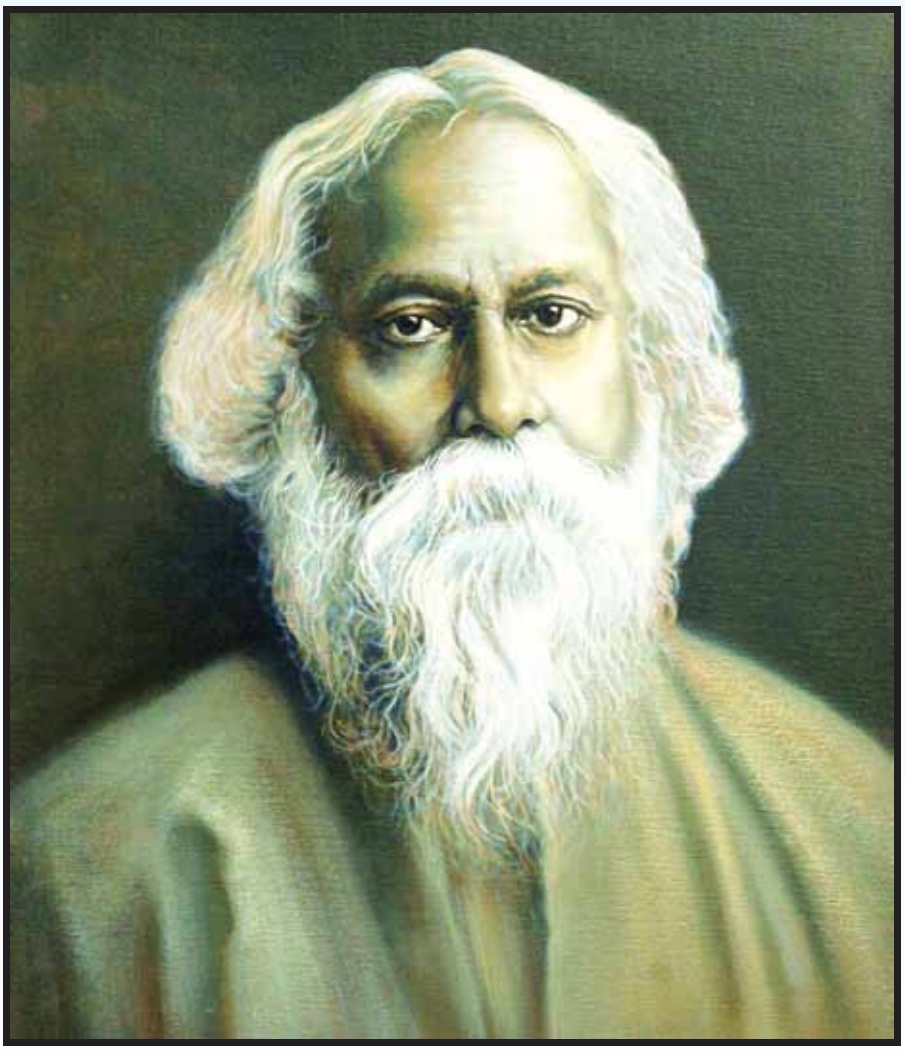

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকীয়

সতেরোই মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৮১ সালের এই দিনে প্রায় ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে দেশে ফিরে আসেন তিনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার সময় বিদেশে অবস্থানের কারণে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা প্রাণে বেঁচে যান। পরে দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে ভারত হয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। দিবসটি উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে একটি প্রবন্ধ।

১লা মে শ্রমিক সংহতি দিবস। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিক আন্দোলনে মেহনতি মানুষের দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস স্মরণে এবং মেহনতি শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নতুন করে উজ্জীবিত হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে মহান মে দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশে দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। শ্রমিক ও মালিক পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রেখে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মহান মে দিবস উপলক্ষে পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। মে দিবস নিয়ে রয়েছে দুটি নিবন্ধ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮তম জন্মবার্ষিকী ২৫শে বৈশাখ ১৪২৬। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর অবাধ বিচরণ। প্রথম বাঙালি হিসেবে ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে বিশাল অবদান রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর স্মরণে এ সংখ্যায় কয়েকটি প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রয়েছে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল কবিতা ও গানে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতিকে করেছেন উজ্জীবিত। প্রেম, দ্রোহ ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২০তম জন্মবার্ষিকী ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪শে মে অসুস্থ কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে জাতীয় কবির মর্যাদা দেন। এ সংখ্যায় রয়েছে জাতীয় কবির স্মরণে নিবন্ধ ও প্রবন্ধ।

১৪ই মে বিশ্ব মা দিবস, ২৮শে মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস এবং ২৯শে মে বিশ্ব শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ এবারের সচিত্র বাংলাদেশ-এ স্থান পেয়েছে। এছাড়া রয়েছে গল্প, কবিতাসহ অন্যান্য নিয়মিত বিষয়।

আশা করি, এবারের সংখ্যাটি সবার ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন
সম্পাদক
সুফিয়া বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান
সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৯৩৩২১২৯, ৪৯৩৫৭৯৩৬
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ
সতেরোই মে
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন
বরকতময় রজনি শবেবরাত ৬
ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন
বিশ্ব মা দিবস
মায়ের অধিকার সন্তানের কাছে সবচেয়ে গুরুত্ববহ ৭
সিনথিয়া ইসলাম
ঐতিহাসিক পহেলা মে ৯
ফারিহা রেজা
শ্রমিকের অধিকার ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা ১০
আশরাফুল আলম
মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ১১
রেহানা শাহনাজ
সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ১৩
আফতাব চৌধুরী
ছায়ানটের সূচনা ১৪
বিনয় দত্ত
উন্নয়নের বিস্ময় বাংলাদেশ ১৬
শওকত হোসেন
নজরুলের কবিতায় নারী ১৭
জেব-উন-নেসা জামাল
নজরুল কাব্যে প্রেম ১৮
আতিক আজিজ
২৮শে মে: নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২১
মিতা খান
গ্রামে শহরের সুবিধা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম ২২
এম এ খালেক
বাংলাদেশে পরিযায়ী পাখি ২৫
মোহাম্মদ খালিদ হোসেন
বাংলাদেশের নারীরা এখন সাফল্যের শিখরে ২৭
ফারিহা হোসেন
আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস: প্রাসঙ্গিকতা ও প্রত্যাশা ২৮
হোসেন জাহিদ
ই-পার্লামেন্টের অগ্রযাত্রা ২৯
মো. শাহেদুল ইসলাম
জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর অবদান ৩০
সানজিদা আহমেদ

হাইলাইটস

বেত: অর্থকরী ও পরিবেশ সুরক্ষায় প্রাকৃতিক সম্পদ ৩১
এ.টি.এম নুরুল ইসলাম

গোপন নথিতে বঙ্গবন্ধু ৩৩
কে সি বি তপু

আত্মত্যাগের বীরত্বগাথা

ফায়ারম্যান সোহেল রানার প্রয়াণ ৩৪
ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ৩৫
জান্নাত হোসেন

গল্প

জলরঙের ছবি ৩৬
সেলিনা হোসেন

কবিতাগুচ্ছ ৪১, ৪২, ৪৩
মাকিদ হায়দার, বাবুল তালুকদার, মিয়াজান কবীর দেলওয়ার বিন রশিদ, ইফফাত রেজা, লিলি হক পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, মো. রিয়াজুল ইসলাম, শাহনাজ শিল্পী ভদ্র, জাকির হাসান, মিলি হক, সাদিয়া সিমরান

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৪
প্রধানমন্ত্রী ৪৫
তথ্যমন্ত্রী ৪৬
জাতীয় ঘটনা ৪৭
উন্নয়ন ৪৮
আন্তর্জাতিক ৪৯
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫০
শিক্ষা ৫১
বিনিয়োগ ৫১
শিল্প-বাণিজ্য ৫২
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৩
নারী ৫৪
কৃষি ৫৪
কর্মসংস্থান ৫৫
নিরাপদ সড়ক ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
যোগাযোগ ৫৭
মাদক প্রতিরোধ ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৯
সংস্কৃতি ৬০
প্রতিবন্ধী ৬০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
চলচ্চিত্র ৬২
ক্রীড়া ৬৩
শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন কৌতুকাভিনেতা আনিস ৬৪

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে প্রাণ হারাতে হয়। এসময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে থাকায় তাঁরা প্রাণে বেঁচে যান। পরে দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে তাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহায়তায় ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। তিনি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সামরিক শাসকের কালো থাবা তাঁকে থামিয়ে দেয়। অবশেষে শেখ হাসিনা প্রাণের মায়াকে তুচ্ছ করে প্রবল বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে সতেরোই মে জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। সেদিন ছিল ১৯৮১ সালের ১৭ই মে। এই স্মরণীয় দিবস সম্পর্কে 'সতেরোই মে: বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা–৪

মহান মে দিবস

১লা মে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস। মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আর শ্রমিকদের শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটার স্বপ্ন দেখারও দিন এটি। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে মে দিবসকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের স্বীকৃতি দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ; এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ'। এ দিবস উপলক্ষে 'ঐতিহাসিক পহেলা মে' এবং 'শ্রমিকের অধিকার ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ দুটি দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা–৯ ও ১০

মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধী দুজনই বিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ। তাদের চিন্তা ও চেতনার মিল-অমিল অনেক বোদ্ধা জ্ঞানীর আলোচনার বিষয়। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজির অবস্থান ছিল অকাশ ছোঁয়া। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন প্রধান রাজনীতিবিদ, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। যে আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অহিংস মতবাদ বা দর্শনের ওপর। তাঁর অহিংস মতবাদ ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চালিকা শক্তি। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি লিখেছেন ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ। অসংখ্য গানের গীতিকার এবং একইসঙ্গে একজন ব্যতিক্রমী মেধাবী চিত্রশিল্পীও বটে। তাঁর লেখনীতে রয়েছে বহুমাত্রিক দর্শন। বুদ্ধিবৃত্তিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে তাঁরা পরস্পর ভিন্ন ঘরানায় অবস্থান করেছেন তথাপি উভয়ের লক্ষ্য ছিল ভারতের মুক্তি। তাদের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধুত্ব, পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও প্রীতি আজীবন বজায় ছিল। এ বিষয়ে 'মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা–১১

নজরুলের কবিতায় নারী

নজরুলের ব্যক্তি জীবনের মতো তাঁর কবি মানসেও নারী বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কবির মতে, পৃথিবীতে যেসব গৌরবময় সৌন্দর্যমণ্ডিত সৃষ্টি রয়েছে তাতে নারী-পুরুষের অবদান সমান সমান। বিদ্রোহী কবি নজরুল স্পষ্ট উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, নারী জাতি সমাজের গলগ্রহ তো নয়ই বরং পুরুষের কর্মে সে সর্বদা সহযোগিতাই করেছে এবং জগতের শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারও অবদান রয়েছে। নারীকে বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে, তার ব্যথা-বেদনা, বঞ্চনা, কর্ম, সাধনা, ত্যাগ, সৌন্দর্য বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করে তার সামগ্রিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন কবি। তারই আলোকে রচিত 'নজরুলের কবিতায় নারী' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–১৭

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

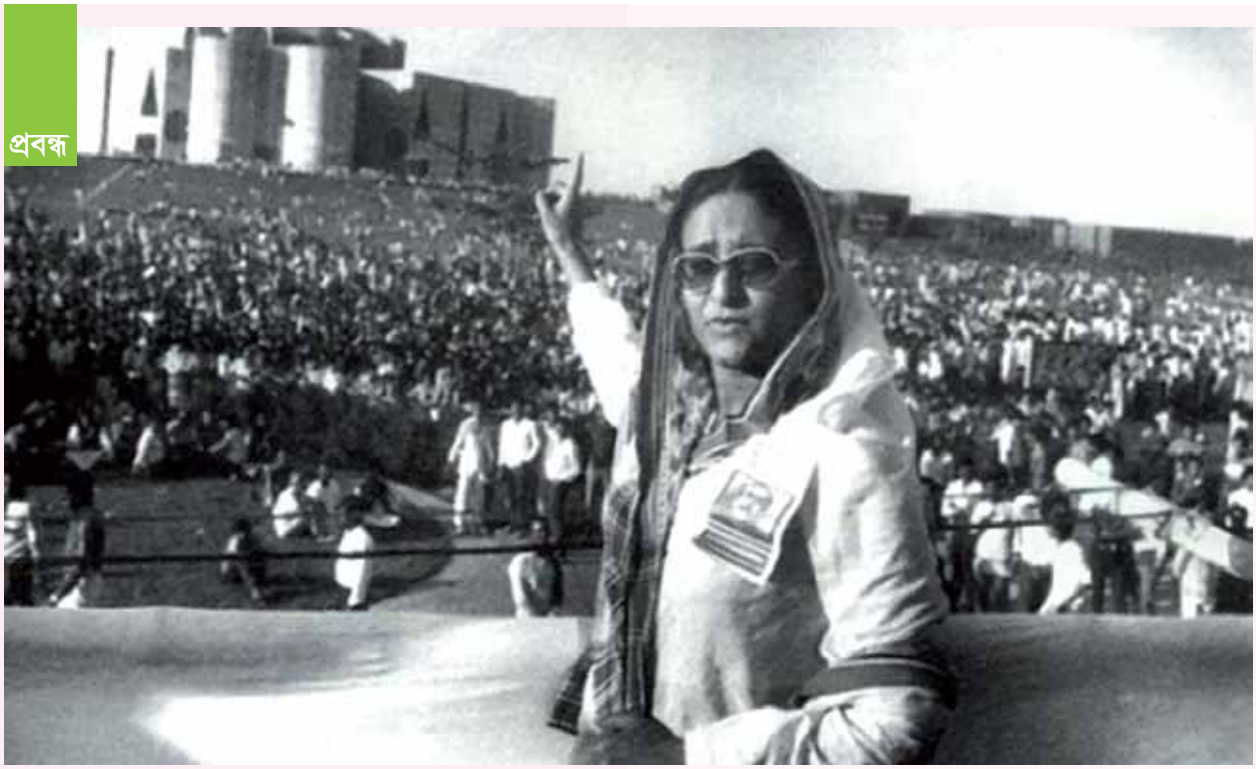

১৯৮১ সালের ১৭ই মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

সতেরোই মে

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ঘটনাবহুল জীবনের দুটি দিন বিশেষভাবে স্মরণীয়-বরণীয়। ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের পর দীর্ঘদিন নির্বাসনে কাটিয়ে দেশের মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেবার প্রত্যয় নিয়ে সামরিক শাসকদের রক্তচক্ষু ও নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এ দুটি দিবসই আমাদের কাছে স্মরণীয় এবং বরণীয়। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে এক বৈরী পরিবেশে আমরা তাঁকে শোক-বিহ্বল-চিত্তে বরণ করেছিলাম। শেখ হাসিনা স্বদেশে ফেরায় আমরা পঁচাত্তরের পরে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। আমাদের সেই স্বপ্ন যেমন সফল হয়েছে, তেমনি দিনটি আমাদের প্রতিবছর স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের দুঃসহ জীবনযাপন এবং শেখ হাসিনা ও রেহানার কথা।

পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বাঙালির জীবনে বেদনার দিন। এদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার প্রাণ হারাতে হয়। আরো প্রাণ হারাতে হয় তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজনদের। এসময় বঙ্গবন্ধুর আদরের দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে ছিলেন। এ কারণে তাঁরা প্রাণে বেঁচে যান। বেঁচে যাওয়া দুই বোনের তখন পলাতক ও কষ্টের জীবন শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যে তাঁরা ফিরে আসেন ভারতে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের একাত্তরের মিত্রমাতা ইন্দ্রিরা গান্ধীর কারণে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন।

পঁচাত্তরের সেই দিনগুলো শেখ হাসিনার কেমন ছিল, আর কেমন ছিল বাংলাদেশের মানুষ ও জনজীবন! খুনি মোশতাক-জিয়া বাংলাদেশের অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সংবিধান কেটেছেঁটে ভূলুণ্ঠিত করেছিল। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করা যাবে না– এমন অধ্যাদেশ জারি করেছিল খুনি মোশতাক আর তা সংবিধানে প্রতিস্থাপন করেছিল আর এক খুনি জিয়া। শুধু তাই নয়, এই জিয়াই বাঙালির শত্রু, মুক্তিযুদ্ধের শত্রু ও একাত্তরের খুনিদের দেশে এনে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নিষিদ্ধকৃত সাম্প্রদায়িক দলসমূহকে অনুমতি দিয়েছিল এই জিয়া। আর নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক, মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষদের অকাতরে হত্যা করেছিল। আর বঙ্গবন্ধুর দল এদেশের মানুষের প্রাণপ্রিয় সংগঠন আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের ওপর চালিয়ে ছিল স্টিম রোলার। এক অর্থে বঙ্গবন্ধু শব্দটি বাংলার আকাশে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তখন বাংলাদেশ মিনি পাকিস্তান তথা মানবতা অপরাধীদের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। জিয়ার হ্যাঁ-না ভোট, প্রেসিডেন্ট ভোট ও সংসদ নির্বাচনের সেই রূপকথার চিত্র বাংলার মানুষ ভোলেনি।

পঁচাত্তরের পরবর্তী সেই দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নির্বাসিত জীবনে জাতির পিতার বিচার, সামরিক শাসনের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছুটে বেড়িয়েছেন। নিবিড় যোগাযোগ রেখেছিলেন দেশের মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। একাশির ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে দলের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। তিনি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু জিয়ার কালো থাবা তাঁকে থামিয়ে দেয়। অবশেষে শেখ হাসিনা প্রাণের মায়াকে তুচ্ছ করে প্রবল বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে সতেরোই মে জন্মভূমিতে ফিরে আসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

সেদিন ছিল ১৭ই মে ১৯৮১, অপরাহ্নে বাংলার শোকে ভেজা মাটিতে পা রেখেছিলেন শেখ হাসিনা। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে মানিক মিয়া এভিনিউতে অভ্যর্থনা জানানোর অকুস্থল। সেদিন রাস্তার দুধারে ছিল লক্ষ লক্ষ জনতা। আর সামনে ছিল জনসমুদ্র। মঞ্চে উঠে শেখ হাসিনা কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং লক্ষ লক্ষ জনতাকে সালাম জানান। সেদিন আকাশও শোকে ভেঙে পড়েছিল। জনসমুদ্রে তিনি শোককে শক্তিতে পরিণত করে বলেছিলেন: আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই এবং হারাবারও কিছু নেই। আমি মানুষের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছি, আমি মানুষের কল্যাণ চাই। কথা ছিল অভ্যর্থনা শেষে পিতৃগৃহে ফিরবেন। মা-বাবা, ভাইবোনের রক্তভেজা বাড়িতে অবস্থান করবেন। কিন্তু জিয়ার শাসানিতে বঙ্গবন্ধু ভবনের রুদ্ধ দুয়ার খোলেনি। রাস্তায় শামিয়ানা টানিয়ে মা-বাবার স্মরণে মিলাদ পড়েছিলেন তিনি। অবশ্য রাষ্ট্রপতি সাত্তারের আমলে রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। এরপর '৯৬ সাল পর্যন্ত তাঁকে মৃত্যুকে সঙ্গী করে বাংলার জনপদে মিছিল-মিটিং করতে হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, কতবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। সে যেন পাকিস্তান আমলের মতো সংগ্রাম-লড়াই ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের অবিনাশী আন্দোলন। যেটি সারাজীবন বঙ্গবন্ধু করেছিলেন।

শেখ হাসিনা নির্বাসন থেকে স্বদেশে না ফিরলে দেশের কী হতো? মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষ ও বাংলাদেশের অবস্থা কেমন হতো? এ প্রশ্ন আমাদের হৃদয়ে জাগা স্বাভাবিক। আমরাতো দেখেছি '৭৫ থেকে ২১ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ শুধু নামেই ছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে সমূলে বিনাশ করা হয়েছিল। গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার বন্দি করা হয়েছিল সামরিক ছাউনিতে। '৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের সরকার তথা শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণ করে সকল বন্ধ দুয়ার খুলতে শুরু করেন। সংবিধানে ফিরিয়ে আনেন '৭১-এর চেতনা। পর্যায়ক্রমে জনগণের ক্ষমতা, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার, একাত্তরের মানবতা অপরাধীদের বিচার, পার্বত্য শান্তিচুক্তি, ভারতের পানি চুক্তি, ছিট মহল সমস্যার সমাধান, স্বাধীনতার স্মারক স্থাপন, একুশ ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে জাতিসংঘের স্বীকৃতি, শেখ হাসিনার শান্তি মডেল প্রাপ্তি, জাতিসংঘের বিষয়ভিত্তিক পুরস্কার লাভ, দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ, মধ্যবিত্ত আয়ের দেশে পরিগণিত হওয়া, সামুদ্রিক বিজয়, পদ্মা সেতু নির্মাণ, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সুনাম অর্জন, মহাশূন্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপন, মুজিববর্ষ ঘোষণাসহ দেশকে স্বনির্ভর করে তোলা, কেবলমাত্র শেখ হাসিনার একান্ত আগ্রহ ও উদ্যোগ গ্রহণের কারণেই সম্ভব হয়েছে। শেখ হাসিনার মাদার অব হিউম্যানিটি অর্জন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়– তিনি শুধু রোহিঙ্গাদের নয়, বিশ্বের অধিকারহারা মানুষের জননী। তিনি বঙ্গজননী থেকে হয়েছেন বিশ্বজননী। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করলে এর কোনোটাই সম্ভব হতো না। তিনি স্বদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন। তিনি আমাদের স্বপ্ন-সারথি, তাঁর দিঘল আঁচলের মমতায় ঢাকা সমগ্র বাংলাদেশ। সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির এই পবিত্র ভূমিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিবসটি চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। পরম বিধাতা তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করুন।

লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

নারীর জীবন বদলে দেওয়া ৫ উদ্ভাবন

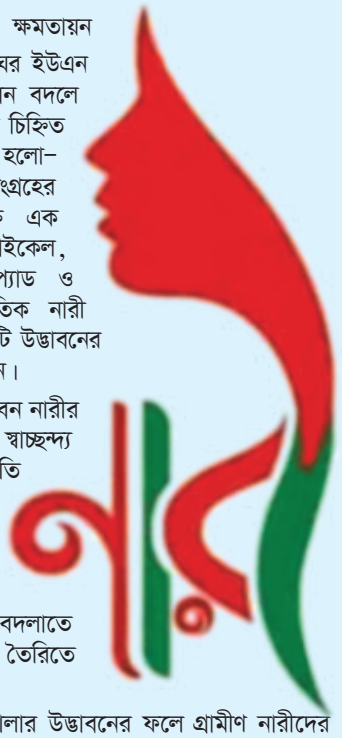

নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করা জাতিসংঘের ইউএন উইমেন সংস্থা নারীর জীবন বদলে দিয়েছে এমন ৫টি উদ্ভাবন চিহ্নিত করেছে। উদ্ভাবনগুলো হলো– হিপ্পো বোলার (পানি সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত চাকাযুক্ত এক ধরনের ড্রাম), বাইসাইকেল, ইন্টারনেট, স্যানিটারি প্যাড ও প্যান্ট। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে এই পাঁচটি উদ্ভাবনের কথা জানায় ইউএন উইমেন।

সংস্থাটি বলছে, এসব উদ্ভাবন নারীর জীবনকে সহজ করেছে, স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে, তার চলাচলের গতি বাড়িয়েছে, নারীকে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হতে সহায়তা করেছে। এসব উদ্ভাবন প্রথাগত ধারণা বদলাতে এবং লিঙ্গ সমতার আবহ তৈরিতে সহায়তা করেছে।

হিপ্পো বোলার: হিপ্পো বোলার উদ্ভাবনের ফলে গ্রামীণ নারীদের পানি সংগ্রহের কষ্ট কমেছে। ফলে তারা অন্য উপার্জনক্ষম কাজে নিজেদের যুক্ত করতে পারছে। জাতিসংঘের হিসাবে এখন বিশ্বের ২১০ কোটি মানুষ সহজপ্রাপ্য নিরাপদ পানির সংকটে আছে। আর এ সংকট বেশি মোকাবিলা করতে হয় নারীদের। স্থানান্তরযোগ্য ব্যারেল আকৃতির এই হিপ্পো বোলার বা ড্রাম ভূমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে নেওয়া যায় এবং এতে সনাতন পাত্রের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি পানি ধরে। ফলে সময় এবং পরিশ্রম দুটোই কম লাগে।

বাইসাইকেল: বাইসাইকেল উদ্ভাবন নারীকে অধিকতর চলাচল ও স্বাধীনতার সুযোগ দিয়েছে। ফলে নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ১৮৯৪-৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এক নারী বাইসাইকেল নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণে বের হন। সেই থেকে ধীরে ধীরে বাইসাইকেল নারীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ইন্টারনেট: বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে নারীর জন্য উন্মুক্ত পরিসর তৈরি করেছে ইন্টারনেট। এর মাধ্যমে নারী শিখতে পারছে, নিজের পেশা বেছে নিতে পারছে, সক্রিয় কর্মীর ভূমিকা পালন করতে পারছে এবং সর্বোপরি সচেতন হয়ে ওঠছে।

স্যানিটারি প্যাড: নারীর স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিরাট অবদান রেখেছে স্যানিটারি প্যাড। এটি সামাজিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্যানিটারি প্যাডের প্রথম বাণিজ্যিক আবির্ভাব ঘটে। এই যুগান্তকারী উদ্ভাবনটি নারী ও কিশোরী স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। এটি স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতি বাড়িয়ে দেয়, কাজ ও উপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করে।

প্যান্ট: ইউএন উইমেন বলছে কাজের দুনিয়া বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর পোশাকেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তারা কাজের সুবিধার জন্য প্যান্ট পরা শুরু করে। অনেক দেশের কারখানায় নারী শ্রমিকেরা ঢিলেঢালা প্যান্ট পরে কাজ করে, সেটি ফ্যাশনের জন্য নয়, এই প্যান্ট পরে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

প্রতিবেদন: জে আর লিপি

নিবন্ধ

বরকতময় রজনি শবেবরাত

ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

মানুষের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-ক্ষতি, সম্মান-অসম্মান, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিসহ সবকিছুই লাইলাতুন নিসফে মিন শাবান তথা শাবানের মধ্যরাতে সম্পন্ন হয় বলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্লেষকরা মত ব্যক্ত করেছেন। সে কারণে এই রাতকে শবেবরাত বা ভাগ্য রজনি হিসেবেও দেখা হয়। পবিত্র শাবান মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদার পেছনেও শবেবরাতের মহিমা ও তাৎপর্য অপরিসীম।

ইতিহাসের স্বতঃসিদ্ধ তথ্য হচ্ছে, মহানবি (সা.) পূর্বেকার সব নবি-রাসুলের উম্মতরা দীর্ঘ হায়াত পেয়েছেন। ফলে বহুদিন পর্যন্ত নেক আমল তথা ভালো কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ তাঁরা অর্জন করেন। কিন্তু আখেরি জমানার পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের ক্ষেত্রে বাস্তবতা হচ্ছে, তাদের আয়ুষ্কাল পূর্ববর্তীদের তুলনায় খুবই সীমিত। এই স্বল্পায়ু উম্মতের অধিকতর পুণ্য অর্জনের জন্য যেসব দিবস ও রজনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উপঢৌকন হিসেবে এসেছে– পবিত্র শবেবরাত তারই অন্যতম এক উপলক্ষ; যে রাতে বন্দেগি-উপাসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি ঘটনার অবতারণ করা যেতে পারে। হজরত ঈসা (আ.) সময়ে সংঘটিত ঘটনাটি শবেবরাতের মহিমাকে আরো মর্যাদা এনে দিয়েছে। নবি ঈসা (আ.) একদা পথ অতিক্রম করছিলেন। পথিমধ্যে তিনি একটা বৃহদাকার প্রস্তর প্রত্যক্ষ করলেন। পাথরটি অভিনব সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছিল। ঈসা (আ.) পাথরের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে এর চারদিক প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। অকস্মাৎ নবির প্রতি ঐশ্বরিক বাণীর আওয়াজ ভেসে এল– হে ঈসা (আ.), একটা পাথর দেখে তার সৌন্দর্যে আশ্চর্যান্বিত হয়ে চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করছ, তুমি কি পাথরের ভেতরকার আরো আশ্চর্যকর কিছু দেখতে চাও? নবির আগ্রহ বেড়ে গেল। তিনি দেখতে চাইলেন। হঠাৎ করেই পাথরটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং পাথরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত তাপস; হাতে তসবিহ এবং মুখে তাঁর আল্লাহর গুণকীর্তন। বিস্ময়-পুরুষ নবি ঈসাকে (আ.) সালাম দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন। ঈসা (আ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– আপনি কতদিন এই পাথরের ভেতর ইবাদত করছেন? রহস্য পুরুষের সাবলীল জবাব, চারশ বছর। নবি আরো বিস্মিত হলেন। বললেন– চারশ বছর পাথরের ভেতর! কী খেলেন আর কীভাবেই-বা বেঁচে থাকলেন? বিস্ময়-অলি নবিকে দেখালেন, ওই যে পাথরের ভেতরেই রয়েছে একটি খেজুর গাছ। সেখানে আমার চাহিদা অনুযায়ী নিত্যদিন সুস্বাদু খেজুর উৎপাদিত হতো, আমি খেতাম, জীবনধারণ করতাম আর মহান আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতাম। এভাবেই কেটে গেছে দীর্ঘ চারশ বছর। নবির কাছে বিস্ময়ের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। ঈসা (আ.) ভাবলেন, যে লোক দুনিয়ার ফেতনা-ফ্যাসাদে না জড়িয়ে একটি স্বর্গীয় অলৌকিক পাথরে বিশেষ ব্যবস্থায় দীর্ঘ চারশ বছর ইবাদতে নিমগ্ন থেকেছেন, তিনি হয়ত সবচেয়ে বেশি পুণ্যবান বান্দা হিসেবে আল্লাহপাকের দরবারে পরিগণিত হবেন। কিন্তু নবি ঈসা (আ.) এই ভাবনার ফলশ্রুতিতে আবারো সেই ঐশ্বরিক বাণী উচ্চকিত হলো, আমার আখেরি জমানার মহান পয়গম্বরের অনুসারী হয়ে শাবান মাসের মধ্যরাতে (শবেবরাতে) যে ব্যক্তি ইবাদত করবে, সে চারশ বছর বিরামহীন ও রিয়াহীন ইবাদতকারী এই নিষ্কলুষ রহস্য-তাপসের চেয়েও অধিক পুণ্যবান বান্দা হিসেবে আমার কাছে পরিগণিত হবে। শবেবরাতের প্রকৃত মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য এই ঘটনার মধ্য দিয়েই অনুধাবন করা যায়।

অনন্য মহিমা আর অনবদ্য বৈশিষ্ট্যে মোড়ানো এই পবিত্র শবেবরাত। এ রাত দোয়া-প্রার্থনা কবুলের রাত, এ রাত পাপাচার থেকে মুক্তি অর্জনের রাত, এ রাত বান্দার তওবা-অনুশোচনা মঞ্জুর হওয়ার রাত, এ রাত যাবতীয় বালা-মুসিবত তথা বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারের রাত এবং এ রাত প্রতিটি মানুষের আগামী এক বছরের ভাগ্য নির্ধারণের গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এক রাত। রজব মাসের প্রথম রাত, দুই ঈদের রাত এবং শবেকদরের রাতসহ বান্দার দোয়া কবুল হয় যে পাঁচটি পবিত্র রাতে তার অন্যতম হলো এই শবেবরাত। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী, শবেবরাতের জন্য মহানবির (সা.) নির্দেশনা হলো, এ দিবসে সিয়ামব্রত পালন আর রাতে আল্লাহর ইবাদত করা। কেননা, এ রাতে মহান আল্লাহর এক অপূর্ব রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়। দুনিয়ার একেবারে কাছাকাছি এসে মহান বিশ্বনিয়ন্তা ঘোষণা করতে থাকেন- কে আছ গুনাহগার, আমি তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে দেব। কে আছ অন্নপ্রার্থী, আমি তোমার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেব। কে আছ বিপদগ্রস্ত, আমি তোমাকে বিপদমুক্ত করব। এভাবেই পূর্বদিগন্তে সূর্য উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সাফল্য ও মুক্তি লাভের ঘোষণা অব্যাহত থাকে। শবেবরাতে অসংখ্য ফেরেশতারা পৃথিবীতে অবতরণ, ইবাদতকারীদের পর্যবেক্ষণ, শান্তির সুবাতাস প্রবাহিতকরণ এবং বিশেষ এ রাতকে জীবন্ত রাখার ব্যাপারে মহানবির (সা.) নির্দেশনা শবেবরাতকে এক অনন্য মর্যাদায় আসীন করেছে। এ রাতের ব্যাপারে নবিপত্নী হজরত আয়েশা সিদ্দিকার দেওয়া তথ্যটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আমি রাসুলে পাকসহ একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন আমার ঘুম ভাঙল দেখি, রাসুল আমার পাশে নেই। খুঁজতে গিয়ে তাঁকে জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে পেলাম। আমি শুনতে পাচ্ছি নবিজি বলছেন, শবেবরাতে মহান আল্লাহ সর্বনিম্ন আকাশে নেমে আসেন এবং আরবের কালব উপজাতির ছাগলের পশমতুল্য বা তারচেয়েও বেশি সংখ্যক মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য মওকুফ করে দেন।

বস্তুত আল্লাহর বান্দাদের কাছে প্রতিটি রাতই ইবাদতের এবং প্রতিটি ক্ষণই মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ। আবহমানকাল থেকে চলে আসা এসব বিশেষ, পবিত্র দিবস ও রজনি আজ আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশেষ করে শবেবরাতে রাতভর ইবাদতে মশগুল থাকা, রাত জাগরণ ও বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা। এসবই এখন আমাদের উৎসবের এবং উপভোগের অনুষঙ্গ হয়ে গেছে। খোদাভীরুতা, এস্তেগফার, দোয়া-প্রার্থনা, জিকির-আসকার, কোরান তেলাওয়াত, কবর জিয়ারত, আত্মীয়ের সান্নিধ্য- এসবের কোনোটাই নেতিবাচক কাজ নয়; বরং ব্যস্ত দিনপঞ্জিতে আর পার্থিব কোলাহলের মাঝে বিশেষ উপলক্ষে এসব মানবিক, ধর্মীয় ও মূল্যবোধগত কর্ম সম্পন্নকরণের মধ্য দিয়ে নিজেদের মানসিকতা আরো ইতিবাচক করে তোলার এক চমৎকার সুযোগ অর্জিত হয়। তাই শবেবরাত নিয়ে কোনো ধরনের এখতেলাফ বা মতপার্থক্য সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় এবং এর অস্তিত্ব অস্বীকার করে সাধারণ মানুষকে এ রাতের ইবাদত থেকে নিরুৎসাহিত করার মধ্যেও কোনো কল্যাণ থাকার কথা নয়। পাশাপাশি এ রাতকে ঘিরে কারো বাড়াবাড়ি করা, আতশবাজি, পটকা ফোটানোসহ জনজীবনে দুর্ভোগ বয়ে আনে এমন কিছু করাও সঙ্গত বা প্রত্যাশিত নয়। বরং ইসলাম ও এর শরিয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকেই পুণ্যার্জনের ব্রত নিয়ে মহিমান্বিত রজনি শবেবরাতের প্রকৃত কল্যাণ হাসিল করা বাঞ্ছনীয়।

লেখক: গবেষক ও অধ্যাপক

বিশ্ব মা দিবস

মায়ের অধিকার সন্তানের কাছে সবচেয়ে গুরুত্ববহ

সিনথিয়া ইসলাম

পৃথিবীর সবচেয়ে মধুরতম ডাকটি হচ্ছে 'মা'। ধরণীতে মায়ের মুখ দেখার পূর্বেই শিশু তার মায়ের সাথে পরিচিত হয়। মায়ের অস্তিত্বের সাথে তার অস্তিত্ব জড়িয়ে থাকে। সন্তানের চাওয়া-পাওয়া একমাত্র মা'ই বোঝেন। গর্ভাবস্থায় মা তার সুখ-শান্তি বিসর্জন দেন ভবিষ্যৎ আগন্তুকের জন্য। ১০ মাস ১০ দিন অমানবিক কষ্ট সহ্য করার পর ভূমিষ্ঠ হয় একটি শিশু। সদ্যোজাত এই সন্তানকে ঘিরেই মায়ের যত স্বপ্ন। ভুলে যান নিজের সকল চাহিদা। দিন-রাত অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় পাহারা দেন শিশু সন্তানটিকে। ছোট্ট শিশুটির মনের কথা সবার আগে তিনিই বুঝতে পারেন। সন্তানের মুখের হাসির জন্য করতে পারেন সব কিছু। ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে কোলের ছোট্ট শিশুটি। ওর আধো আধো বুলিতে মা ডাকে মুছে যায় সমস্ত যন্ত্রণা। আত্মহারা হয়ে যান তার মুখের হাসিতে। সন্তান যতই তার শিশু নামটি ঘোচাতে থাকে, মায়ের সংগ্রাম ততই বেড়ে চলে। মা কোমর বেঁধে নামেন তাকে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। অনেক মা আছেন, সন্তানকে সময় দেওয়ার জন্য নিজের বহুল কাঙ্ক্ষিত চাকরিটিও পর্যন্ত ছেড়ে দেন। স্বামী মারা গেলেও সন্তানের মুখ পানে চেয়ে দ্বিতীয় বিবাহের কথা কল্পনাও করেন না। শিশু যখন তার শৈশব-কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করে তখন থেকে মায়ের প্রয়োজনীয়তা কমতে থাকে। সবক্ষেত্রেই যে এমনটি হয় তা নয়। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমনটিই ঘটতে দেখা যায়। আমরা ভুলেই যায় আমাদের জীবনে মায়ের অবদান কতটুকু। তার জায়গাটাই বা কোথায়। একবার সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মদকে (সা.) তার একজন সাহাবি প্রশ্ন করলেন– আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার পাওয়ার দাবিদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবি আবার প্রশ্ন করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। সাহাবি ৩য় বার প্রশ্ন করলেন, এরপর? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবি ৪র্থ বার একই প্রশ্ন করলে তিনি পিতার হক আদায়ের তাগিদ দেন। মায়ের অধিকার যে সন্তানের কাছে সবচেয়ে বেশি এটা বোঝাতেই তিনি ৩ বার মা'র কথা বলেছেন। সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আল-কোরানের সূরা আনকাবুতে আল্লাহ বলেছেন– 'আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি'। হাদিসে এসেছে নবি (সা.) বলেছেন– 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত'। মায়ের সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করে সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে– 'স্ববংশবৃদ্ধিকামঃ পুত্রমেকমাদাস্য....' আবার সন্তান লাভের পর নারী তার রমণী মূর্তি পরিত্যাগ করে মহীয়সী মাতৃরূপে সংসারের অধ্যক্ষতা করবেন। তাই 'মনু' সন্তান প্রসবিনী মাকে 'গৃহলক্ষ্মী' সম্মানে অভিহিত করেছেন। বলেছেন– 'উপধ্যায়ন দশাচার্য্য আচায্যাণাং শতং পিতা। সহস্র পিতৃম্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে' (মনু, ২/১৪৫) অর্থাৎ দশজন উপাচার্য সমান একজন আচার্য্য (ব্রাহ্মণ), একশ আচার্য্য সমান পিতা, আর সহস্র পিতার সমান সম্মান মায়ের। অথচ আমাদের কাছে মায়ের অবস্থান কোথায় সেটা আমরা ভেবেও দেখি না। ভাবার সময়'ই বা কোথায়? ইসলামসহ প্রতিটি ধর্ম যে মাকে এতটা সম্মান দিয়েছে। যে মা আমাদের জন্য ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছেন। নিজের চাহিদা ভুলে আমাদের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই মাকে আমরা বৃদ্ধাশ্রমে রাখার কথা ভাবছি। এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষা, মায়ের ভালোবাসা ও ত্যাগের প্রতিদান! অনেক সন্তানকে (সমাজের সম্ভ্রান্ত বলে পরিচিত) বলতে দেখি– 'সমস্যাটা কি? ওখানে (বৃদ্ধাশ্রমে) সমবয়সি অনেকের সাথে থাকলে তার মন ভালো থাকবে। স্বস্তির সাথে থাকবে। তাছাড়া আমাদের বাড়তি সময়ই বা কোথায়? মাকে দেখাশুনা করব? তারচেয়ে বরং বৃদ্ধাশ্রমই ভালো। টাকাতো সময়মতোই পাঠিয়ে দিই। মায়ের ভালো থাকার কথা ভেবেই প্রতিমাসে এতগুলো টাকা খরচ করছি। কেন যে উপজেলা পর্যায়ে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হচ্ছে না'। সেই সুযোগ্য সন্তানটির উদ্দেশ্যে বলছি– আপনি কি আদৌ জানেন মা কিসে ভালো থাকে? সন্তান-পরিজন ছেড়ে কোনো মা ভালো থাকতে পারে বলে আমার জানা নেই। এমন কেউ আছেন যিনি পরিবার ছেড়ে থাকতে ভালোবাসেন এমন মায়ের সন্ধান দিতে পারেন? আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি এমন মা পৃথিবীতে একজনও নেই। একটু চিন্তা করুন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আপনার মা যদি আপনাকে কোনো শিশু নিকেতনে রেখে আসতেন। ওই মাকে কি আপনি কোনোদিনও সম্মান করতেন, ভালোবাসতে কিংবা মেনে নিতে পারতেন? নিশ্চয়ই পারতেন না। এত ত্যাগ স্বীকার করার পরও যে মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখতে দ্বিধা করেন না তাকে আবার সম্মান করতেন! ভিখারি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন মাও হাজার ব্যস্ততা, শত কর্মের মধ্যেও সন্তানকে অন্যের কাছে দেওয়ার কথা ভাবেন না।

নেপোলিয়ান বলেছিলেন–

'Give me a educated mother
I will give you a educated nation'.

অর্থাৎ তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি উন্নত জাতি উপহার দেব। এখানে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মাকে বোঝানো হয়নি। নৈতিক শিক্ষারও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নেপোলিয়ান বলতে পারতেন– 'Give me a educated father'

তিনি তা বলেননি। কারণ তিনি জানতেন সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশে মায়ের বিকল্প নেই। মায়ের প্রতি

সম্মান দেখিয়ে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মে মার্কিন কংগ্রেসে 'মা দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়। সেই থেকে প্রতিবছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের প্রায় ৪৬টি দেশে দিবসটি পালিত হয়। কথিত আছে, ব্রিটেনেই প্রথম মা দিবস পালনের রেওয়াজ শুরু। সেখানে মে মাসের ৪র্থ রবিবার 'মাদারিং সানডে' হিসেবে পালিত হতো। তবে সতেরো শতকে মা দিবস উদ্‌যাপনের সূত্রপাত ঘটান মার্কিন সমাজকর্মী জুলিয়া ওয়ার্টসন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে মা দিবস পালন করা হয় ১৮৫৮ সালের ২রা জুন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট 'উড্রো উইলসন' সর্বপ্রথম মা দিবসকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা দেন। বাণিজ্যিকভাবে দিবসটি বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম কার্ড আদান-প্রদানকারী দিবস। আমেরিকার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে– মা দিবসে অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি ফোন করা হয়। জুলিয়া ওয়ার্ড হোই রচিত 'মাদার্সডে প্রক্লামেশন' বা 'মা দিবসের ঘোষণাপত্র' মার্কিন যুক্তারাষ্ট্রে মা দিবস পালনের গোড়ার দিকের প্রচেষ্টাগুলোর অন্যতম। আমেরিকান গৃহযুদ্ধ ও ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে নৃশংসতার বিরুদ্ধে ১৮৭০ সালে এটি রচিত হয়। এটি ছিল একটি শান্তিকামী প্রতিক্রিয়া। আজ পর্যন্ত ৭ জন মার্কিন প্রেসিডেন্ট 'মা দিবসে ঘোষণাপত্র' পাঠ করেছেন। আরব দেশগুলো ২১শে মার্চ মা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। ইরানে হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর কন্যা ফাতিমার (রা.) জন্মবার্ষিকীর দিন এটি পালন করা হয়।

বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ মা দিবসের পরিবর্তে ৮ই মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালন করে থাকে। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানসহ বেশিরভাগ দেশগুলোতে মে মাসের ২য় রবিবার 'মা দিবস' পালিত হয়। ক্যাথলিক ধর্মে দিনটি বিশেষভাবে 'ভার্জিন মেরী' বা কুমারী মাতার পূজায় সমর্পিত। হিন্দু ধর্মে এটিকে বলে 'মাতা তীর্থ আনুসি'।

মা দিবসে মায়ের প্রতি যে ভালোবাসা দেখানো হয়, তা কৃত্রিমতা ছাড়া আর কিছুই না। আমরা এত আধুনিক হয়ে গেছি যে, এ দিনটিতেও মায়ের কাছে না এসে দূর থেকে এসএমএস করে উইশ করা হয়। বলা হয় 'মা আমি তোমাকে ভালোবাসি।' মুখের ভালোবাসা সত্যিকারের ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা অনুভবে বোঝার বিষয়। আমাদের কাছে মা'র প্রত্যাশা খুবই কম। বয়স্ক হয়ে গেলে বাবা-মা ছোটো শিশুর মতো অসহায় হয়ে পড়ে। এ সময় তারা আমাদের কাছ থেকে একটু বেশি ভালোবাসা, ভালো ব্যবহার প্রত্যাশা করে। যে মায়ের বদৌলতে আমরা পৃথিবীর আলো দেখেছি, তার জন্য একটু সময় বের করতে পারব না? নিশ্চয় পারব। তাই শুধু মা দিবসে নয়। বছরের প্রতিটি দিন আমরা মাকে ভালোবাসবো। তাকে বোঝার চেষ্টা করব। তবেই তো আমরা নিজেদেরকে সুসন্তান বলে দাবি করতে পারব।

লেখক: প্রাবন্ধিক

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বাণী

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলার কৃষক ও মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। ১৮৭৩ সালের ১৬ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৮ বছর বয়সে ১৯৬২ সালের ২৭শে এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। ২৭শে এপ্রিল ছিল এই নেতার ৫৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই মহান নেতার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথকভাবে বাণী প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর বাণীতে বলেন, শেরে বাংলা ছিলেন গণমানুষের নেতা। তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থে ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি (কেপিপি) এবং ১৯৫৩ সালে শ্রমিক-কৃষক দল প্রতিষ্ঠা করেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শেরে বাংলা এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজসংস্কারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বাংলার শোষিত ও নির্যাতিত কৃষক সমাজকে ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর উদ্যোগে গঠিত 'ঋণ সালিশী বোর্ড' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বঙ্গীয় চাকুরি নিয়োগবিধি, প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজনী আইন, দোকান কর্মচারী আইন প্রণয়নের ফলে এ অঞ্চলের অবহেলিত কৃষক-শ্রমিক উপকৃত হন। কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। আমি এ নেতার ৫৭তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলার কৃষক ও মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক-এর ৫৭তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শেরে বাংলা এদেশের কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে আজীবন কাজ করে গেছেন। কৃষকদের অধিকার আদায়ে তিনি সব সময় ছিলেন সোচ্চার।

তিনি ছিলেন উপমহাদেশের এক অনন্য সাধারণ প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। রায়তদের ওপর জমিদারগণ যে আবওয়াব ও সেলামি ধার্য করতেন, তিনি তার বিলোপ সাধন করেন। তাঁর সাহসী নেতৃত্ব, উদার ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য জনগণ তাঁকে 'শেরে বাংলা' বা 'বাংলার বাঘ' খেতাবে ভূষিত করেন। বাংলার গবির-দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর অসীম মমত্ববোধ ও ভালোবাসা এদেশের মানুষকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করবে। আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

প্রতিবেদন: পিনক আলম

ঐতিহাসিক পহেলা মে

ফারিহা রেজা

ঐতিহাসিক পহেলা মে বিশ্বের সকল শ্রমিক ও মেহনতি জনতার কাছে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিবস, যা মহান মে দিবস হিসেবে বিবেচিত। একইসঙ্গে মে দিবস বেদনার এবং অধিকার আদায়ে সংগ্রামী হওয়ার শপথের দিন। মে দিবস একটি আন্তর্জাতিক দিবস ও সরকারি ছুটির দিন। মে দিবস তথা শ্রমিক দিবসের ইতিহাস দীর্ঘ।

৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে শ্রমিকরা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনরত থাকে। শ্রমিকরা একটানা ১৬ ঘণ্টা কাজ করত এবং কর্মক্ষেত্র ছিল অনিরাপদ। ১৮৬০ সালের শুরুর দিকে শ্রমিকেরা দাবি করে পারিশ্রমিক না কমিয়ে কর্মঘণ্টা করতে হবে ৮ ঘণ্টা। শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস দাবি করলেও মালিকপক্ষ বাঁধ সাধে। সে সময় শ্রমিকদের কাছে সমাজতন্ত্র ছিল একটি নতুন ধারণা। বহু শ্রমিক তখন সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উজ্জীবিত হতে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণের এমন এক মাধ্যম যাতে ধনী আরো ধনী এবং দরিদ্র শ্রমিকরা আরো দরিদ্র হয়। উদ্বৃত্ত শ্রম সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত মূল্য যা পুঁজিপতির সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। প্রতিবছর বহু নারী, পুরুষ এমনকি শিশু শ্রমিকরা নিরাপত্তাহীনতায় কর্মক্ষেত্রে কাজ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ফলে বিশ বছরের নিচের শ্রমিকদের মৃত্যুহার ছিল ভয়াবহ।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু সংগঠনগুলো শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে খুব একটা সফল হতে পারেনি। পরবর্তীতে এসব শ্রমিক সংগঠনগুলোর জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় শিকাগোতে, ১৮৮৪ সালে। আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে '১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে ৮ ঘণ্টা করে কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করা হোক'। শ্রমিকদের এই ন্যায্য দাবিকে কেউ দমায় রাখতে পারেনি। অবশেষে সেই ১লা মে ১৮৮৬ সালে শুধু শিকাগোতেই প্রায় ৮ লক্ষাধিক শ্রমিক রাস্তায় নেমে আসে কাজ বন্ধ করে। পুলিশ এই শান্তিপূর্ণ মিছিলে হঠাৎ করেই গুলি ছুড়ে। তাতে ১ জন আন্দোলনরত শ্রমিক নিহত হয় এবং পরবর্তীতে আরো ৫ থেকে ৬ জন শ্রমিক নিহত হয়। অগণিত শ্রমিক গুরুতর আহত হয়। এরপর কয়েক বছর পেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের 'দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করার' দাবি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পায়। ১৮৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হয় আর্ন্তজাতিক শ্রমিক সম্মেলন। ১লা মে কে 'শ্রমিক দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৮৯০ সাল থেকে ১লা মে বিশ্বব্যাপী পালন করে আসছে, 'মে দিবস' বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে।

মে দিবস আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভের পরেই শ্রমিক শ্রেণির মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ওপর এ দিবসের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। মে দিবসের স্বীকৃতির পরেই শুরু হয় মেহনতি মানুষের শৃঙ্খলিত জীবনের মুক্তি। বিশ্বের ইতিহাসে সংযোজিত হয় সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি নতুন অধ্যায়। মে দিবস হচ্ছে গোটা পৃথিবীর শ্রমজীবী সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনা করার দিন। শ্রেণি-বৈষম্যের বেড়াজালে যখন তাদের জীবন বন্দি ছিল তখন মে দিবস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এর পরেই আস্তে-আস্তে লোপ পেতে থাকে সমাজের শ্রেণি বৈষম্য। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি মধ্যম আয়ের দেশ। এদেশে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে মালিক পক্ষের সম্পর্কের নতুন দিগন্ত বর্তমানে ভাবনার বিষয়। উদ্বৃত্ত শ্রমে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে পৃথিবীর সব পুঁজিপতিরাই। তারপরও মে দিবস এই আলোকবর্তিকা উন্মোচিত করেছে যে, শ্রমিক ভালো থাকলে, শোষণ কমলে পৃথিবীর মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

ঐতিহাসিক মে দিবসের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান, আজকের শ্রমিক শ্রেণিকে আগলে রেখেছে। ১৯৮৬ সালের রক্তঝরা সেই ১ লা মে এখন সবার কাছে অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জোর সংগ্রামের শপথ গ্রহণের দিন। ১লা মে সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের সামনে এগিয়ে যাবার মুলমন্ত্র হোক, এটা আমাদের সবারই লক্ষ্য।

লেখক: প্রাবন্ধিক

জেনোসাইড কর্নার

ঐতিহাসিক ভবন সুগন্ধায় সম্প্রতি স্থাপিত জেনোসাইড কর্নারটি বিদেশ থেকে আগত রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, মন্ত্রী, এমপি ও বিদেশি কূটনীতিকদের পরিদর্শনের এবং সেখানে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাছাড়া সারাদেশের স্কুল, কলেজসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা গণহত্যা বিষয়ে জানার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে জেনোসাইড কর্নারটি পরিদর্শন করতে পারবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, স্বাধীনতার ৪৮ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গণহত্যার শিকার মহান শহিদদের স্মরণে একটি জেনোসাইড কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৯৭১ সালের গণহত্যার শিকার হওয়া ৩০ লাখ মানুষকে স্মরণ করার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী আরো বলেন, ঐতিহাসিক এ স্থান থেকেই ইয়াহিয়া খান গণহত্যার আদেশ দেন। এই ভবনেই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাথে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। গণহত্যার স্বীকৃতি আদায় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ ভবনে জেনোসাইড কর্নারটি গড়ে তোলা হয়েছে এবং ১৮ই এপ্রিল তা উদ্‌বোধন করা হয়।

প্রতিবেদন: জেসিকা হোসেন

নিবন্ধ

শ্রমিকের অধিকার ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

আশরাফুল আলম

বিশ্বের শ্রমিক, মেহনতি, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাসকে মনে করিয়ে দিতে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নতুন করে উজ্জীবিত হওয়ার প্রত্যয় নিয়ে প্রতিবছরই ১লা মে দিনটি শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেট স্কোয়ারে মূলত আট ঘণ্টা শ্রমের দাবিতে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে রক্তাক্ত ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছিল তাকে স্মরণ করে প্রথমে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো পরবর্তীতে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ ১লা মে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

বিশ্ব সভ্যতার বিনির্মাণে শ্রমিক মেহনতি মানুষের ভূমিকা ব্যাপক। আজ আমরা বিশ্বব্যাপী যে সকল উন্নতি ও অগ্রগতি, বিলাস, চাকচিক্য, জাঁকজমকতা দেখতে পাই তার সব কিছুরই পিছনে আছে কোনো না কোনো শ্রমিকের ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত প্রচেষ্টার ঘাম ঝরানো স্মৃতিচিহ্ন। উৎপাদনের চারটি মূল উপাদানের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো শ্রম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ ও আধুনিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় ও সহজতর হলেও শ্রমিকবিহীন উৎপাদন কখনো কল্পনা করা যায় না। সৃষ্টির শুরু থেকেই উৎপাদন ব্যবস্থায় এই শ্রমনির্ভরতা চলে আসছে।

সম্পদের মালিকানাকে কেন্দ্র করে যে সমাজ বিকাশ লাভ করেছে সেখানে দুটো আলাদা শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল দৃশ্যমান অর্থাৎ একটা মালিক শ্রেণি ও অন্যটি শ্রমিক বা দাস শ্রেণি। অতঃপর সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে সেখানেও এই দুটি বিপরীতধর্মী শ্রেণি একইভাবে বিরাজমান। একটা শ্রেণি ভূমির মালিক আরেকটি শ্রেণি কৃষিশ্রমিক বা ভূমিদাসে পরিণত হয়। এখানে কৃষিশ্রমিক শ্রেণির বৈশিষ্ট্য বা জীবনযাপনে পূর্বের দাসদের থেকে দৃশ্যমান কোনো ইতিবাচক পার্থক্য লক্ষ করা যায়নি। এসব কৃষিশ্রমিকের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, ছিল না ন্যূনতম মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের সুযোগ। তাদের কাজ ছিল রাজা বা সামন্তপ্রভুদের (Barons/Nobles) সেবায় জীবন উৎসর্গ করা।

অষ্টাদশ শতকে শিল্পবিপ্লব বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। উৎপাদন ব্যবস্থায় আসে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রের প্রয়োগ। ইংল্যান্ড কেন্দ্রিক এই শিল্পবিপ্লব শুরু হলেও অল্প দিনেই এর ঢেউ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক হারে শিল্পায়ন হতে থাকে। এর ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, অর্থনীতির পালে হাওয়া লাগে, চিন্তা-চেতনা ও জীবনযাত্রায় আসে ব্যাপক পরিবর্তন। শিল্প বিপ্লবের পেট থেকে জন্ম নেওয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হিসেবে বিকশিত হয়। মালিক বা পুঁজিপতিগণ অন্যান্য উপকরণের মতো শ্রমিককে তাদের মুনাফা লাভের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। শ্রমিকের জীবনমান পূর্বে যে স্তরে ছিল, সেই স্তরেই যেন আটকা পড়ে। যুগ যুগ ধরে এভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিভিন্নমুখি পরিবর্তন সাধিত হলেও শ্রমিকশ্রেণির অবস্থার কোনো কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হয়নি। উপরন্তু তাদের কর্মঘণ্টাও সুনির্দিষ্ট ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত হাড়ভাঙা শ্রম দিতে হয়েছে। একটা সময় দেশে দেশে তারা অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আট ঘণ্টা শ্রমের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে এবং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করে। কাজের চাপে নিষ্পেষিত হয়ে মরার চেয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অত্মত্যাগ করাকে অনেক শ্রমিকই শ্রেয় মনে করে। অবশেষে ১৮৮৬ সালে ১লা মে শিকাগো শহরের হে মার্কেট স্কোয়ারে সাড়ে তিন লাখের মতো শ্রমিক ৮ ঘন্টা শ্রমের দাবিতে একত্রিত হয়। শিকাগো যেন শ্রমিকের মিলন মেলায় পরিণত হয়। ৩রা মে ম্যাককর্মিক রিপার নামক কারখানায় মালিক শ্রেণির সমর্থন পুষ্ট শাসকগোষ্ঠীর লেলিয়ে দেওয়া পুলিশের গুলিতে ৬ জন শ্রমিকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়। ফলে আন্দোলনের দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ৪ঠা মে হে মার্কেট স্কোয়ারে আবারো শ্রমিক সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। সেদিনের বৃষ্টি উপেক্ষা করে দলে দলে শ্রমিক যোগ দেয় সেই সমাবেশে। সমাবেশের শেষ পর্যায়ে পুলিশ শ্রমিক সমাবেশে নির্বিচারে গুলি চালায়। শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত হয় হে মার্কেট স্কোয়ার। পুলিশ-শ্রমিক চলমান সংঘর্ষের বিস্ফোরণে ৮ জন কারণে এক পর্যায়ে বোমা পুলিশ মারা যায়। যে পুলিশ আরো মারমুখি হয়ে পড়ে। পুলিশের গুলিতে মারা যায় অসংখ্য শ্রমিক। বহু শ্রমিককে কারারুদ্ধ করা হয়। শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বে দেওয়ার অভিযোগে বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে শ্রমিক নেতা পার্সন্স, স্পাইজ, জজ এঞ্জেল ও ফিসারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

নানা প্রহসনের পর অবশেষে শ্রমিকদের দাবির কাছে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরিশেষে যুক্তরাষ্ট্রে 'ওয়াল্‌স্ হিভেল অ্যাক্ট' এবং 'ফেয়ার লেবার স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট' প্রণীত হয়– যার মাধ্যমে ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবি স্বীকৃতি পায়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কর্মের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

বাংলাদেশে মে দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালিত হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইনে ২০০৬ অনুসারে একজন শ্রমিকের ৮ ঘণ্টা শ্রমের কথা বলা হয়েছে। তবে শর্তসাপেক্ষে ৮ ঘণ্টার বেশি শ্রমের বিধানও রয়েছে।

বাংলাদেশে ৬ কোটি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ৮৬ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক যারা শ্রম আইনের আওতাভুক্ত নয়। তারা বিভিন্নভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে নীরবে তাদের শ্রম দিয়ে যাচ্ছে, তারা বিভিন্নভাবে হচ্ছে শোষিত, বঞ্চিত। তাদের কর্মঘণ্টা, বেতন কাঠামো বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আজও সুনির্দিষ্ট বা স্পষ্ট নয়। তাদের সব কিছুই মালিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

বর্তমান সরকার শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরি ও উন্নত জীবন পেলে, কর্মনিরাপত্তা নিশ্চিত হলে একদিকে যেমন শ্রমিক অসন্তোষ কমবে, তেমনি উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে, গতিশীল হবে দেশের অর্থনীতি, যার সুফল সবাই ভোগ করবে। মনে রাখতে হবে, শ্রমিক বাঁচলে দেশ বাঁচবে, দেশ বাঁচলে সবাই বাঁচবে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

রেহানা শাহনাজ

রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী উভয়েই বিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন ১৯৬১ সালে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯৪১ সালে। ভারতের এই দুই মহান ব্যক্তির মধ্যে ছিল পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও বিরোধ। গান্ধী জাতীয়তাবাদী ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতে, জাতীয়তাবাদীরা আত্মকেন্দ্রিক। বিদেশি দ্রব্য বর্জন, বিদেশি কাপড় পোড়ানো আত্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ। গান্ধী জবাবে বলেছিলেন, জাতীয়তাবাদ না হলে কেউ আন্তর্জাতিকতাবাদী হতে পারেন না। বিশ্ব ইতিহাসে এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের বিশাল অবদান বিস্মৃত হবার নয়।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সকলের কাছে মহাত্মা গান্ধী নামেই সমধিক পরিচিত। মহাত্মা অর্থ মহান যে আত্মা। তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে 'মহাত্মা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য আমজনতার হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৎকালীন ভারত যে আলোকবর্তিকার সাহায্যে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল, সেই আলোকবর্তিকা হলেন মহাত্মা গান্ধী। অহিংসাই ছিল যাঁর আমৃত্যু সাধনা। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন প্রধান রাজনীতিবিদ, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। যে আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অহিংস মতবাদ বা দর্শনের ওপর ভিত্তি করে। তাঁর অহিংস মতবাদ ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চালিকা শক্তি। তিনি ছিলেন সারাবিশ্বের শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ে আন্দোলনের অন্যতম অনুপ্রেরণা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী যখন আফ্রিকার কালো চামড়ার মানুষের ভোটাধিকার আদায়ে নির্যাতন ও ঘৃণা তুচ্ছ করে লড়াইয়ে সফল হচ্ছিলেন। তখন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ১৯১৫ সালে পি এফ এন্ড্রুজ মারফত গান্ধীজিকে ভারতে এসে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার অনুরোধ জানান। সে সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। কবি তখন মহাত্মার বন্ধু পি এফ এন্ড্রুজের মারফত মহাত্মাকে অভিনন্দন ও আশিস জানিয়েছিলেন।

'জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া লাভ কি? পৃথিবীতে কে কাহার...'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাব ও চিন্তার জন্য সারাবিশ্বে এখনো গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক ও নানা বিষয়ে সমকালীন চিন্তাবিদ হিসেবে স্বতন্ত্রের অধিকারী। যদিও পাশ্চাত্য জগতে তিনি মরমিবাদী হিসেবে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। সারা বিশ্বে তখন তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল এবং ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ *গীতাঞ্জলী* কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান, ঐ বছরের মার্চ মাসে লন্ডন থেকে বইটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। নভেম্বর মাসে যখন নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ততদিনে *গীতাঞ্জলী*-র দশ দশটি ইংরেজি সংস্করণ মুদ্রিত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন রাশান আনা আখমাতোবা। যিনি ১৯৬০ সালের মধ্যভাগে রাশিয়ান ভাষায় কিছু কবিতা অনুবাদ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন, 'কবিতার যে শক্তিশালী প্রবাহ হিন্দুবাদ ও গঙ্গা থেকে উৎসারিত ও অনুপ্রাণিত তারই নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতার অভিজাত হিন্দু জমিদার পরিবারে, যাদের বেশিরভাগ ভূসম্পত্তি ছিল বাংলাদেশে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই বলেছেন, তাঁর পরিবার হচ্ছে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ– এই তিন সংস্কৃতির সম্মিলিত স্রোতধারার ফল। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর আরবি ও ফারসি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কারবাদী ধর্মীয় সংঘ 'ব্রাহ্ম সমাজে' অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ এমন এক পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন, সেখানে সংস্কৃত ও সনাতন হিন্দু ধর্মগ্রন্থের গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি ফারসি সাহিত্য ও ইসলামি ঐতিহ্য সম্পর্কেও তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন ধর্মের সংমিশ্রণে ভিন্নধারা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রশ্নাতীত।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ছোটো শহরতলী শান্তি নিকেতনে। যেখানে, ১৯০১ সালে তাঁর স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে সৃষ্টি হয় নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার। শান্তি নিকেতন এমনই এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রধর্মী কবিতাই লেখেননি। তিনি লিখেছেন ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ। অসংখ্য গানের গীতিকার এবং একইসঙ্গে একজন ব্যতিক্রমী মেধাবী চিত্রশিল্পীও বটে। তাঁর লেখনীতে রয়েছে বহুমাত্রিক দর্শন। ১৯৯৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তীতে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি সংকলন প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি কী ধরনের জ্ঞানচর্চা ও চিন্তাভাবনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা প্রমাণের জন্য এই পত্র সংকলনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী উভয়ের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধুত্ব, পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও প্রীতি আজীবন বজায় ছিল। তবে একসময় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যে গান্ধীজির অনুসৃত রাজনৈতিক দর্শন ও সমাজসংস্কারের প্রশ্নে বিশ্বকবি প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন বিশ্বকবি। আসলে বুদ্ধিবৃত্তিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে তাঁরা পরস্পর ভিন্ন ঘরানায় অবস্থান করেছেন তথাপি উভয়ের লক্ষ্য ছিল ভারতের মুক্তি। শৃঙ্খল থেকে, দারিদ্র্যতা থেকে ভারতের মুক্তিই ছিল উভয়ের লক্ষ্য।

ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজীর অবস্থান ছিল অকাশ ছোঁয়া। করমচাঁদ গান্ধী গোরবন্দরের হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন গোরবন্দরের দেওয়ান (প্রধানমন্ত্রী)। মা পুতলিবা ছিলেন করমচাঁদের চতুর্থ স্ত্রী। ছোটোবেলা থেকেই জীবের প্রতি অহিংসা, নিরাময় ভোজন ও আত্মশুদ্ধির জন্য উপবাস থাকার চর্চা করেছেন তিনি। একসময় তিনি দাদা আবদুল্লাহ অ্যান্ড সন্স-এর আইনজীবী হিসেবে আফ্রিকায় যান। তখন আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভোটাধিকার ছিল না। তিনি সেসময় ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম করেন।

মহাত্মা গান্ধী দেশীয় জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বকবির মর্যাদায় আসীন। রবীন্দ্রনাথ একসময় স্থানীয় বিখ্যাত *মডার্ন রিভিউ* সাময়িকীতে ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় মহাত্মার চরকা আন্দোলনকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আদর্শকে আঘাত করে কথা বলেন। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভে অসহযোগ আন্দোলন কোনো কার্যকর পন্থা নয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তিনি গান্ধীজীর ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি ও উর্দু প্রস্তাবেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মহাত্মা 'রাওলট অ্যাক্ট'-এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। রাওলট অ্যাক্ট পাস হলে বিশ্বকবি মহাত্মার পাশে এসে দাঁড়ান। রবীন্দ্রনাথ তাকে সমর্থন করেন। ১৯১৯ সালের ৮ই এপ্রিল গান্ধীজিকে বন্দি করে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে সমগ্র ভারতে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সে সময় বিশ্বকবি ব্রিটিশরাজ কর্তৃক দেওয়া 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন এবং কারাবন্দি গান্ধীজীকে খোলা চিঠিতে জানান 'মহাত্মার নেতৃত্বেই ভারত স্বাধীন হবে'।

মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন ১৯২০ সালে। এসময় কবি ভারতের বাইরে ছিলেন। কবি অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেন। ভারতে ফিরে কবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ভাষণে বলেন– 'অসহযোগ আন্দোলন' হলো রাজনৈতিক সন্ন্যাস। কবির মতে, অসহযোগের পরিবর্তে পৃথিবীর মানুষকে সহযোগিতা দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে অসহযোগ সত্যকে ব্যাহত করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে যে মেলবন্ধন সেটিই সত্য। গান্ধী কবির সমালোচনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'কবির উদ্বেগ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। গান্ধীজী লেখেন, আমরা ভুল পথে চলছি বলে কবি উৎকণ্ঠিত। কবিকে অভয় দিচ্ছি, আমরা বিচ্ছিন্নতা, হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার পথে অগ্রসর হচ্ছি না। কবি ভাবছেন– অসহযোগ আন্দোলন পাশ্চাত্য ও ভারতের মধ্যে প্রাচীর। কবির অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে– পারস্পারিক শ্রদ্ধার ওপর 'অসহযোগ আন্দোলন' প্রতিষ্ঠিত।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধী দুজনই বিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ। তাদের চিন্তা ও চেতনার মিল-অমিল অনেক বোদ্ধা জ্ঞানীর আলোচনার বিষয়। জওহরলাল নেহেরু তখন ব্রিটিশ শাসিত ভারতের কারান্তরীণ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট জেলে বসে তাঁর ডায়রিতে লিখলেন– 'গান্ধী ও ঠাকুর দুজনই ভারতের আদর্শ স্বরূপ ও মহান ব্যক্তিত্ব, তবু তাঁরা একে অপরের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আজকের পৃথিবীর মহামানবদের মধ্যে গান্ধী ও ঠাকুর মানুষ হিসেবেও সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার সৌভাগ্য এই যে, তাদের দুজনেরই খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি'।

লেখক: প্রাবন্ধিক

সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

আফতাব চৌধুরী

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ছোটগল্পের জন্মস্থান যে সাময়িকপত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক নামিদামি লেখকেরা সাময়িকপত্রের প্রয়োজনে গল্প লিখতে শুরু করেন। বাংলা ছোটগল্পের জন্মদাতা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি– খুব অল্প বয়স থেকে পত্রপত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলো নিয়ে *হিতবাদী*, *সাধনা*, *ভারতী* এবং *সবুজপত্র* পত্রিকাগুলোকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলোকে চারটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। সেগুলো হলো– হিতবাদী পর্ব, সাধনা পর্ব, ভারতী পর্ব এবং সবুজপত্র পর্ব। আলাদাভাবে এ সকল পর্বের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্বারা রবীন্দ্রগল্পের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যায় এবং তার প্রয়োজনও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

হিতবাদী পর্বের ছোটগল্প: *হিতবাদী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে অর্থাৎ ১২৯৮ বঙ্গাব্দে। এ পত্রিকার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জড়িত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগটি সম্পাদনা করতেন। কিন্তু প্রকাশ করার মতো উপযুক্ত গল্প না পেয়ে তিনি নিজেই গল্প লিখতে শুরু করেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে তিনি *হিতবাদী*তে প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটি করে গল্প লিখতে শুরু করেন– তখন জমিদারি কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য পদ্মাতীরে বাস করেন তিনি। এ অবকাশে তিনি বাংলার গ্রাম্যজীবন সম্পর্কে পরিচয় লাভের সুযোগ পান।

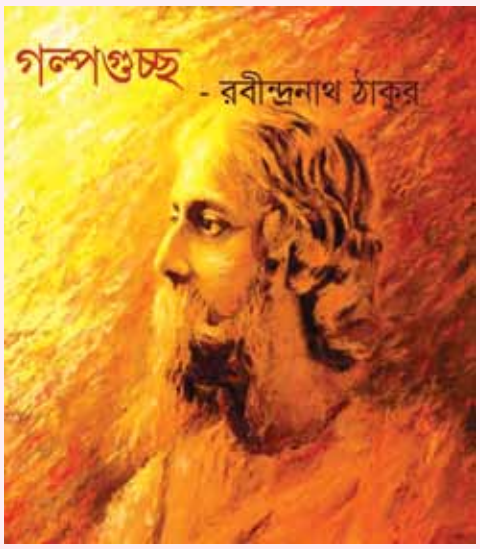

*হিতবাদী*তে রবীন্দ্রনাথ পরপর ছয়টি গল্প লিখেছিলেন। সেগুলো হলো– *দেনাপাওনা* (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮), *পোস্ট মাস্টার* (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮), *গিন্নী* (৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮), *রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা* (৭ আষাঢ় ১২৯৮), *ব্যবধান* (১৪ আষাঢ় ১২৯৮) এবং *তারা প্রসন্নের কীর্তি* (২১ আষাঢ় ১২৯৮)। তবে *হিতবাদী*র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বেশিদিন থাকেনি। কারণ পত্রিকার সম্পাদকের রুচি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখতে পারেননি। তাই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। তবে এ পত্রিকা তাঁর যে সৃষ্টির দুয়ার খুলে দিয়েছিল তা কিন্তু বন্ধ হয়নি। পরবর্তীতে তিনি *সাধনা* পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন।

সাধনা পর্বের ছোটগল্প: ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে *সাধনা* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই তিনি নিজের প্রতিভাকে এ পত্রিকায় উজাড় করে দিয়েছিলেন। সাধনার আয়ু ছিল চার বছর অর্থাৎ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দের কার্তিক পর্যন্ত। প্রথম তিন বছর এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চতুর্থ বছরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর সম্পাদক হন। চার বছরে *সাধনা*তে মোট ৩৬টি গল্প তিনি লিখেছিলেন। তাছাড়া *মানসী* এবং *সোনার তরী* কাব্যের অনেক কবিতাও এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাই *সাধনা* পর্বকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সুবর্ণযুগ বলা যায়।

১২৯৮ বঙ্গাব্দে *সাধনা*তে প্রকাশিত প্রথম গল্প *খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন*। তাছাড়া এ বছরে প্রকাশিত হয়– *সম্পত্তি সমর্পণ*, *দলিয়া*, *কঙ্কাল*, *মুক্তির উপায়* গল্পগুলো।

১২৯৯-তে প্রকাশিত হয় *ত্যাগ*, *একরাত্রি*, *একটি আষাঢ়ের গল্প*, *জীবিত ও মৃত*, *রীতিমত নভেল*, *স্বর্ণমৃগ*, *জয় পরাজয়*, *কাবুলিওয়ালা*, *ছুটি*, *সুভা*, *মহামায়া*, *দান প্রতিদান*। ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়– *সম্পাদক*, *মধ্যবর্তিনী*, *অসম্ভব কথা*, *শাস্তি*, *একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প*, *সমাপ্তি*, *সমস্যাপূরণ*। ১৩০১-এ প্রকাশিত হয়– *অনধিকার প্রবেশ*, *মেঘ ও রৌদ্র*, *প্রায়শ্চিত্ত*, *বিচারক*, *নিশীথে*, *আপদ*। ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়– *মানভঞ্জন*, *ঠাকুরদা*, *প্রতিহিংসা*, *ক্ষুধিত পাষাণ* ও *অতিথি*।

এ পর্যায়ের প্রায় প্রতিটি গল্পে রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রয়েছে। তবে বেশি সংখ্যক গল্প লেখার ফলে তিনি কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েন– তাই তাঁর গল্পের সংখ্যা কিছুটা কমে আসে। *সাধনা* পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনায় সাময়িকভাবে বিরতি আসে।

ভারতী পর্বের ছোটগল্প: ১৮৭৭ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় *ভারতী* পত্রিকা। মোট সাতজন সম্পাদক বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ১৮৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ এ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র এক বছর পত্রিকাটি সম্পাদনা করলেও নিজের দক্ষতায় তিনি পত্রিকাটিকে *সাধনা*র সমতুল্য করেছিলেন। এ পত্রিকায় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় তিনি *দুরাশা* গল্পটি লিখেন। তারপর ওই একই বছরে তিনি লিখেন– *পুত্রযজ্ঞ*, *ডিটেকটিভ*, *অধ্যাপক*, *রাজটিকা*, *মণিহারা* এবং *দৃষ্টিদান* গল্পগুলো। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গল্প *নষ্টনীড়*। ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসে তিনি লিখেন– *রামমণির ছেলে* এবং পৌষ সংখ্যায় *পণরক্ষা* নামে একটি গল্প।

সবুজপত্র পর্বের ছোটগল্প: বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে ১৯১৪ সাল এক উল্লেখযোগ্য বছর। এ বছরে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সবুজপত্র* পত্রিকা। এ পত্রিকাটি বাংলা সাময়িকপত্রের জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করে। রবীন্দ্রনাথ ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের পৌষ পর্যন্ত মোট দশটি গল্প লিখেছিলেন এ পত্রিকায়। পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই তিনি আধুনিককালের জন্মলগ্ন ঘোষণা করলেন। এ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গল্পগুলো হলো– *হালদার গোষ্ঠী*, *স্ত্রীর পত্র*, *পয়লানম্বর*, *হৈমন্তী*, *বোষ্টমী*, *ভাইফোটা*, *শেষের রাত্রি* এবং *অপরিচিতা*। তারপর কিছুদিন বিরতির পর লিখলেন– *তপস্বিনী*, *পাত্র-পাত্রী*। *সবুজপত্র* পর্যায়ের গল্পগুলো সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন– *সবুজপত্রে*র মুক্তি পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে।... *সবুজপত্রে*র আগে এবং পরে যেন আমরা দুই রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই'। এ পর্যায়ের গল্পগুলোর প্রধান কৃতিত্ব হলো, চলতি গদ্যরীতির ব্যবহার, মনস্তত্ত্বের উন্মোচন, আত্মকথনের ভঙ্গিতে জীবনের ভাষ্য রচনা ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি ছোটগল্প বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের প্রকাশিত হয় *রবিবার*, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে লিখেন *ল্যাবরেটরি*। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে *শনিবারের চিঠি*তে লিখেন– *শেষকথা* গল্পটি। তাঁর যে সমস্ত গল্প পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা যেমন তাঁকে খ্যাতির শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিয়েছে, তেমনি পত্রিকাগুলোকেও করেছে সমৃদ্ধ।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

ছায়ানটের সূচনা

বিনয় দত্ত

আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে দেশের মানুষকে আপন সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে সংগঠনটি সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করে এসেছে তার নাম ছায়ানট। ছায়ানট শুধু একটি সংগীত বিদ্যালয়ই নয়, একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নামও বটে। ছায়ানট সংস্কৃতি ভবন নামে বিশাল ভবন নির্মিত হয়েছে ঢাকার শঙ্কর মোড়ে।

ছায়ানট শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার একটি ধারক-বাহক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি পথিকৃৎ সংগঠন। যে সংগঠন কঠিন সময়ে বাঙালিত্বের কথা বলেছিল, বাঙালি সংস্কৃতির আলাদা ভিত গড়তে চেয়েছিল। সেই ভিত গড়ার ক্ষেত্রে এখন ছায়ানট অনেকাংশে সফল বলা চলে। ছায়ানট এখন বাঙালিত্ব চর্চার এক পীঠস্থান, যে বাঙালিত্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবতায় পৌঁছাতে চেয়েছিল ছায়ানট।

শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ছায়ানটের লক্ষ্য দেশীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীন সত্তা বিকাশে পারঙ্গম হবার জন্য মানুষকে যথার্থ শিক্ষায় সমৃদ্ধ করে তোলা, শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি সমন্বিত শিক্ষার বিকাশ ঘটানো। সংস্কৃতি সাধনা ও চর্চার যথাযথ প্রসার ও বিকাশের মাধ্যমে মানুষের প্রতি ভালোবাসা জন্মানোর উদ্দেশ্যে ছায়ানটের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

এই ছায়ানটের জন্মক্ষণ কিন্তু সহজ কোনো সময়ে ছিল না, বরং প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে ছায়ানটের সূচনা হয়েছিল ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ ১৯৬১ সালে। তখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ নামক কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি। তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। বাঙালি বলে পৃথক জাতিসত্তা আমাদের ছিল না। অখণ্ড পাকিস্তানে পাঞ্জাবিরা পাঞ্জাবি, সিন্ধিরা সিন্ধি, পখতুন পাঠানরাও তাদের আত্মপরিচয়ের গৌরব ধারণ করত। শুধু বাঙালির ওপর ধার্য হয় বাঙালিত্বকে ত্যাগ করে, দলমত নির্বিশেষ পাকিস্তানি হতে হবে।

পাকিস্তানি শাসনের থমথমে পরিবেশেও কিছু বাঙালি একত্র হয়েছিলেন আপন সংস্কৃতির মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষপূর্তির উৎসব করার জন্যে। সারাবিশ্বে যখন রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকীর আয়োজন চলছে তখন বাংলার এই অঞ্চলের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মনেও তার প্রভাব পড়ে। তখন বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদ, ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, খান সারওয়ার মুর্শেদসহ বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। তাদের সাথে ছিল ঢাকার কিছু সংস্কৃতিকর্মীও।

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের পর, তাঁদের একটি দল ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে বনভোজনে যান। তাঁদের মধ্যে মোখলেসুর রহমান (সিধু), শামসুন্নাহার রহমান, আহমেদুর রহমান (ইত্তেফাক পত্রিকার কলামিস্ট ভীমরুল), কবি সুফিয়া কামাল, সন্‌জীদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, ফরিদা হাসান, সাঈদুল হাসানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। বনভোজন শেষে তারা বিকেলের শেষ লগ্নে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চাকে আন্দোলনে রূপ দেওয়ার জন্য একটি সংগঠন তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। এই সূত্রে ফরিদা হাসান ও সাঈদুল হাসানের প্রস্তাবে সংঠনের নাম হয় 'ছয়ানট', রাগিণীর নামে নাম।

বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ সন্‌জীদা খাতুনের ভাষ্যমতে, '১৯৬১ সালে কবি সুফিয়া কামালকে সভাপতি, সায়েরা মহিউদ্দীনকে সহ-সভাপতি এবং ফরিদা হাসানকে সম্পাদক করে ছায়ানটের প্রথম কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটির বিভিন্ন পদে ছিলেন– জহুর হোসেন চৌধুরী, সাঈদুল হাসান, মোখলেসুর রহমান, সাইফুদ্দীন আহমদ মানিক, মিজানুর রহমান ছানা, ওয়াহিদুল হক ও আহমেদুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন। সরকারি চাকুরে ছিলাম বলে আমি সদস্য হতে পারিনি। অবশ্য প্রতিটি সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় যোগ দিয়েছি। অনুষ্ঠান পরিকল্পনা আর পরিচালনার দায়িত্বও পালন করে এসেছি'।

১৯৬২ সালে পুরোনো গানের অনুষ্ঠান উপস্থাপনের মাধ্যমে ছায়ানট কাজ শুরু করে। প্রথম শ্রোতার আসর বসে মোখলেসুর রহমানের বাসায়। কলকাতা থেকে ফিরোজা বেগম এসেছিলেন সেই আসরে গান গাইবার জন্য। দ্বিতীয় আসরে ফাহমিদা খাতুন রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেছিলেন এবং তৃতীয় আসরে শুদ্ধ সংগীতের আয়োজন বসেছিল। শ্রোতাদের আগ্রহ বাড়ার কারণে ঘরে একসময় জায়গার সংকুলান হয়ে পড়ে। সেই সময় ভালো শিল্পী এবং শিক্ষার্থী গড়া জরুরি হয়ে উঠে। তখন ওয়াহিদুল হক কিছুটা দুঃসাহসিক ভূমিকা নেন। ঠিক করলেন সংগীত বিদ্যায়তন গড়বেন। তখন একরকম জোর করে সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে সংগীত বিদ্যায়তন গড়ার কাজ শুরু হয়।

সংস্কৃতির সাধনা, বাঙালি হবার সাধনা ও মানুষ হবার সাধনায় ছায়ানট কাজ শুরু করে। কাজটা খুব যে সহজ ছিল, তা কিন্তু নয়। তখন পাকিস্তানের জোর চেষ্টা দেশের বাঙালিকে পাকিস্তানি মুসলমান বানানোর। তার বিপরীতে ছায়ানট শুরু করে বাঙালিত্বের চর্চা, বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও চেতনাকে পুনরুদ্ধার করে বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার।

১৯৬৩ সালে সন্‌জীদা খাতুনের উদ্যোগে প্রথম বাংলা একাডেমির বারান্দায় সংগীত শেখার ক্লাস শুরু হয়। এই সময় রবীন্দ্র সংগীত শেখাতেন সন্‌জীদা খাতুন ও ফরিদা মালিক। নজরুল সংগীত শেখাতেন সোহরাব হোসেন। তবলা শেখাতেন বজলুল করিম। বেহালা ও সেতার শেখাতেন মতি মিয়া। এই বছরই ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তনের জন্ম হয়। ওস্তাদ আয়াত আলী খান ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তনের উদ্‌বোধন করেছিলেন, আর বিদ্যায়তনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। বিদ্যায়তনের প্রথম

অধ্যক্ষ ছিলেন ঢাকা বেতারের গুণী যন্ত্রী মতি মিঞা (মতিয়র রহমান খান)।

১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুলের সঙ্গে মিলে ছায়ানট প্রথম বর্ষবরণ শুরু করেছিল। সেটা ছিল আসলে ওই স্কুলের বর্ষপূতির আয়োজন। সরু একটা গলির ভেতর কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে প্রথম নববর্ষ উদযাপন করা হয়েছিল। এরপর চৌষট্টি সালেও একই স্থানে নববর্ষ উদযাপন করা হয়। সেই আয়োজনে যুক্ত হলো কিছু নববর্ষের গান। পঁয়ষট্টিতে এসে পড়ল ঈদুল আজহা। ছেষট্টি সালেও একই স্থানে নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হলো।

সেই সময় সন্‌জীদা খাতুনের বন্ধুপ্রতিম ড. নওয়াজেশ আহমেদ বললেন, 'এইসব কি হচ্ছে। আমরা কি স্কুলের অনুষ্ঠান দেখতে আসি। আমরা আসি নববর্ষ দেখতে। নববর্ষের একটা বাণী থাকবে। একটা বার্তা থাকবে। এতটুকু জায়গায় এইটা হয় না'।

ড. নওয়াজেশের কথায় ১৯৬৭ সালে রমনার বটমূলে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন স্থানান্তরিত হলো। ১৯৬৭ সালের ২২শে জুন পাকিস্তান সরকার তথ্যমাধ্যমে রবীন্দ্র সংগীত আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। নানা অজুহাতে পাকিস্তান সরকার বাঙালি সংস্কৃতি চর্চাকে ব্যাহত করার প্রয়াস চালাতে থাকে। বৈরী পরিবেশে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার জন্য ছায়ানট সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। একদিকে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা চালানোর সংগ্রাম, অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হয়ে ওঠার প্রয়াস। ওই বছর রমনা উদ্যানের বটমূলে নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু করে ছায়ানট। এই সময় ছায়ানটকে নানাভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়েছিল পাকিস্তানি সরকার।

রমনা উদ্যানের বটমূল বলা হলেও গাছটা বটগাছ নয়। অশ্বত্থ গাছ। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পুরোধা ব্যক্তি সন্‌জীদা খাতুন বলেন, 'যদি বলি অশ্বত্থ তলায় অনুষ্ঠান করছি, তাহলে শুনতে মনে হয় গ্রামের হাট। যদি বলি বটতলায় তাতেও সেই একই অবস্থা হয়। এই জন্য এ কথা না বলে আমরা বটমূল বলেছিলাম। বটমূল বলবার একটা যুক্তিও দাঁড় করেছিলাম। সেটা হচ্ছে, অভিধান খুললে দেখা যাবে, পঞ্চবটী, পঞ্চ বটের সমাহারই তো। সেই সমাহারটা বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, আমলকি ও অশোকের। যদি পঞ্চবটীতে অশ্বত্থ থাকে, তবে এটাকে বটমূল বললে দোষটা কোথায়?'

সেই ১৯৬৭ সাল শুরু করে এখনো পর্যন্ত প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে ভোরের প্রথম প্রহরে আবাহনী সুরের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই আবাহনী সুরের রেশ মুগ্ধ করে রাখে পুরো দেশবাসীকে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে বর্ষবরণের কোনো আয়োজন ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ছায়ানট বিদ্যায়তন বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ছায়ানটের কর্মীদের অনেকেই ভারতে আশ্রয় নেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। আগ্রহী সংস্কৃতিকর্মীদের নিয়ে মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা গড়ে তারা স্বাধীনতার পক্ষে গান গেয়ে প্রচারণা চালান এবং যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে আবার কাজ শুরু করে ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তন।

এই ব্যাপারে সন্‌জীদা খাতুন বলেন, 'পহেলা বৈশাখের দিনে আমি ছিলাম সাভারের একটি গ্রামে মাটির ঘরে। সেখানে আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে সকাল বেলা গান গেয়েছিলাম। মানে পহেলা বৈশাখ হবে না তা তো হতে পারে না। আমরা পারিবারিকভাবে পালন করেছিলাম। বড়ো করে আয়োজন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। আমাদের অনেকেরই নাম ছিল এলেমিনেশন লিস্টে'।

ছায়ানটের সাড়ে চার দশকের সংস্কৃতি সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানকে তার নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১৯৯৯ সালে তৎকালীন সরকার ধানমণ্ডিতে এক বিঘা জমি বরাদ্দ দেন। এই জমিতে সংস্কৃতি ভবন নির্মাণ করে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে ব্যাপকতর অবদান রাখার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে ছায়ানট। প্রখ্যাত স্থপতি বশিরুল হক বিনা সম্মানীতে ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনের নকশা প্রণয়ন করেন।

২০০২ সালের ১৫ই মে থেকে ধানমণ্ডিতে, ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয়। বিভিন্ন জটিলতার মধ্য দিয়ে নির্মাণ কাজ আগালেও ২০০২ সালে সেপ্টেম্বর মাসের দিকে নির্মাণ কাজ স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবার নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

নির্মাণ সম্পূর্ণ হবার আগেই, সংস্কৃতি ভবনে নিয়মিত কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৬ সালের জুলাই মাসে। বাকি কাজগুলো ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা

হয়। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ২০০৭ সালে সম্পূর্ণ হয় ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনের নির্মাণ কাজ। একই বছরের নভেম্বর মাসে ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনের উদ্‌বোধন করেন চিত্রশিল্পী আসমা কিবরিয়া।

ছায়ানটের নিয়মিত কার্যক্রমে ব্যবহৃত কক্ষের বাইরেও বর্তমানে সংস্কৃতিভবনে রয়েছে– আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপযুক্ত ছায়ানট মিলনায়তন ও রমেশচন্দ্র দত্ত স্মৃতি মিলনকেন্দ্র। সংস্কৃতি-সম্ভার, সংগীত-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাগার 'কবি শামসুর রাহমান পাঠাগার' রয়েছে, রেকর্ডিং স্টুডিও ও বক্তৃতা কক্ষও রয়েছে।

আরো রয়েছে ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তন ছাড়াও বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয় 'নালন্দা', শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশকেন্দ্র 'শিকড়', ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কার্যক্রম 'ভাষার আলাপ' ও 'পাঠচক্র', বাঙালিকে ঘরোয়া পরিবেশে গান শোনানোর আয়োজন 'শ্রোতার আসর' সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে ছায়ানট। নানা গ্রন্থ ও অডিও-সিডি প্রকাশনার বাইরে ছায়ানট নিয়মিতভাবে 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' নামে একটি শিল্প-সাহিত্য ও সংগীত-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছে।

২০০১ সালে পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে জঙ্গিরা বোমা হামলা করে এই আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই আশা পূরণ হয়নি। পরের বছর আরো বড়ো আয়োজনে ছায়ানট বর্ষবরণ উদযাপন করে। এই উদ্‌যাপন, এই বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা, প্রেম, ভালোবাসায় ছায়ানট ২০১৩ সালে, ১৪২০ বঙ্গাব্দে ৫০ বছর পূরণ করে।

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীতে সূচিত হওয়া ছায়ানটের নাম গোটা ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রামে সহায়তা তথা স্বাধীনতার অর্জন পর্যন্ত। ছায়ানটের এই অর্জন সকলের, সকল সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের। এই অর্জন ধারণ করে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে কোনো কালো থাবা আমাদের বিশাল অর্জনকে থামিয়ে দিতে না পারে, কুচিন্তা-সাম্প্রদায়িক ইন্ধন আমাদের মনোবলকে গুড়িয়ে দিতে না পারে। এর জন্য ব্যক্তি থেকে শুরু করে সকল সাংস্কৃতিক সংগঠনকে দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

উন্নয়নের বিস্ময় বাংলাদেশ

শওকত হোসেন

চা বাগানে কাজ করেন মা। খানিক আগেই পিঠ থেকে নামিয়েছেন চা পাতার ঝুড়ি। সেই পিঠে এখন স্কুল ফেরত মেয়ে রাবেয়া। নতুন বছরে নতুন ক্লাসে ওঠার আহ্লাদে মায়ের পিঠে চড়ে, গলা জড়িয়ে আহা কী খুশি! সহাস্য মা-মেয়ের ঘরে ফেরার এই অপরূপ দৃশ্যের আলো যেন উছলে পড়ছে বাগানের মেঠোপথে।

বাংলাদেশের অগ্রগতি উদাহরণ দেওয়ার মতোই। অর্থনীতি ও আর্থসামাজিক বেশিরভাগ সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়াকে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে ছাড়িয়েছে তো অনেক আগেই।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলেছে, একটি জনবহুল ও নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেভাবে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে দারিদ্র্য দূর এবং বৈষম্য কমানোকে সংযুক্ত করেছে, তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন উদাহরণ দেওয়ার মতো একটি দেশ।

আবার আরেকটি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক একটি টেবিল উপস্থাপন করে দেখিয়েছে, প্রধান ১২টি সূচকের মধ্যে ১০টিতেই বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া এবং অন্য নিম্ন আয়ের দেশের তুলনায় এগিয়ে গেছে বা যাচ্ছে।

গত দুই দশকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের যে-কোনো সূচকের বিচারে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশ সার্বিকভাবে প্রবৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল দেশের গড় হারের তুলনায় অনেক এগিয়েছে। দারিদ্র্যের হার অর্ধেক হয়ে গেছে। মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদানের হার দ্রুত বেড়েছে, জনসংখ্যা, গড় আয়ু, শিশুমৃত্যুর হার, মেয়েদের স্কুলে পড়ার হার, সক্ষম দম্পতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের হার ইত্যাদি সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ সমপর্যায়ের উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশ, এমনকি প্রতিবেশী ভারতকে পেছনে ফেলতে সমর্থ হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের তৈরি করা তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে এখন গড় মাথাপিছু আয় হচ্ছে ৫২৮ ডলার। আর দক্ষিণ এশিয়ার গড় আয় এক হাজার ১৭৬ ডলার। এক হাজার ৪৪ ডলার নিয়ে দক্ষিণ এশিয়াকে প্রায় ধরে ফেলেছে বাংলাদেশ। সাফল্য আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারেও। বাংলাদেশে এখন এই হার মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশ আর দক্ষিণ এশিয়ার গড় ১ দশমিক ৪ শতাংশ। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে এই গড় অনেক বেশি, ২ দশমিক ১ শতাংশ।

স্বাধীনতার ঠিক পরেই দেশের মানুষ গড়ে বেঁচে থাকত ৪৬ বছর, এখন সেই গড় ৬৯ বছর। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার গড় হচ্ছে ৬৫ বছর। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে এক হাজার নবজাতকের মধ্যে মারা যায় ৭০ জন, দক্ষিণ এশিয়ায় ৫২ জন, আর বাংলাদেশে ৩৫ জন। মেয়েরা সবচেয়ে বেশি স্কুলে যায় এই বাংলাদেশেই।

বাংলাদেশের এই অর্জন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। প্রথম আলোতে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বাংলাদেশ শুধু যে মুসলিম প্রধান দেশ, তা নয়, এটি উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত এমন একটি অঞ্চলের অংশ, যেখানে রয়েছে মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। এ কারণে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের এই অগ্রগতিকে একটি 'উন্নয়ন বিস্ময়' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এর পেছনে কাজ করেছে জনগণের উন্নয়ন-সচেতনতা, গোত্র-বর্ণ ভেদাভেদহীন সমাজ এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর নানা কার্যকর কর্মসূচি ও সামাজিক উদ্যোগ।

অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন আরো বলেন, মাঠপর্যায়ের এসব কর্মসূচির মাধ্যমেই দেশের মানুষ নানা ধর্মীয় গোঁড়ামিকে ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম নিয়ে যে রাজনৈতিক বিতর্ক, তা দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় উপাদান হিসেবে তেমন কাজ করেছে বলে মনে হয় না।

১৯৯০-এর দশকেও বাংলাদেশে ৫৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। এখন করছে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বলছে, ৬ শতাংশ হারে অব্যাহত প্রবৃদ্ধি অর্জন গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা করেছে। মূলত ৮০ লাখ প্রবাসীর পাঠানো আয়, তৈরি পোশাক খাতের প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক এবং কৃষির সবুজ বিপ্লব বা এক জমিতে দুই ফসল দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের ভূমিকা রেখেছে। আবার সরকারও পিছিয়ে পড়া ও অতিদরিদ্রদের জন্য সামাজিক কর্মসূচি খাতে অব্যাহতভাবে বাজেট বাড়িয়েছে। দেশের ৪০ শতাংশ অতিদরিদ্র মানুষ এখন এই কর্মসূচির আওতায়। এ খাতে সরকার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অংশ হিসেবে যে অর্থ ব্যয় করছে, তা বড়ো অর্থনীতির দেশ ভারতের সমপর্যায়ের। নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা এর চেয়ে অনেক কম অর্থ ব্যয় করে।

বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্যের জন্য নারীর অগ্রগতি বড়ো ভূমিকা রেখেছে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করার কারণে মেয়েদের সন্তান জন্ম দেওয়ার হার কমে যাওয়ায় তারা এখন অনেক বেশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারছেন। ফলে পরিবারের সদস্যসংখ্যা নির্ধারণে নারীর ভূমিকাও বেড়েছে। পোশাক খাতের ৪০ লাখ শ্রমিকের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। এরাই বাংলাদেশকে অনেকখানি এগিয়ে নিচ্ছেন।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ঠিক করা হয়েছিল ১৯৯০ সালে। বাংলাদেশও ওই সময় থেকেই ক্রমান্বয়ে এগিয়েছে। এমডিজি পূরণের বছর ২০১৫। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) তৈরি করা প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, আটটি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বাংলাদেশ এরই মধ্যে অনেকগুলোতে সঠিক পথে আছে, কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। এমডিজি পূরণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এখন সারাবিশ্বে একটি উদাহরণ।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

নজরুলের কবিতায় নারী

জেব-উন-নেসা জামাল

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দেশ-বিদেশের কাব্যে-দর্শনে নারী প্রসঙ্গের অভাব নেই– আর সে প্রসঙ্গ প্রায়শ ভক্তি উচ্ছ্বাসে পরিপ্লুত। নারীকে প্রায় সকলেই প্রথাগতভাবে দেবী আখ্যায় ভূষিত করে এসেছে। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, নারী সম্পর্কে দেশে-দেশে, কালে-কালে ভক্তসম্মত আচরণ তো হয়নি বরং সমাজের যত অত্যাচার, অবিচার ও অবজ্ঞার তীক্ষ্ণ শায়ক নারীকেই বিদ্ধ ও বিক্ষত করেছে। অথচ কথার সঙ্গে কথা গেঁথে নারী সম্প্রদায়কে সম্মান প্রদর্শনের বেলায় কেউ যেন হার মানতে চায়নি। প্রাচীন আর্যশাস্ত্রে নারী পূজার ব্যবস্থা পর্যন্ত আছে অথচ এই অতিভক্তি ক্রমে পরিণতি লাভ করেছে বিকৃত ব্যভিচারে। বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায় এবং কিছু সংখ্যক শাক্ত কবির রচনায় নারী সম্পর্কে আন্তরিকতার ছিঁটেফোঁটা যে নেই এমন নয়, তবে প্রায়শ তা দেবী মহাত্ম্যের শূন্যগর্ভ বিবৃতিমাত্র হয়েছে। অবশ্য প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কাব্যে-দর্শনে আমরা নারী সম্পর্কে আন্তরিক অনুভূতির পরিচয়ও পাই। ইন্দ্রিয় সংস্পর্শশূন্য রমণী পূজার প্রবর্তন করেন দার্শনিক প্লেটো। উল্লেখ্য, Platonic love/friendship অর্থাৎ নিষ্কাম প্রেম/বন্ধুত্ব কথাগুলো ঐ দার্শনিকেরই বিশেষ চিন্তাসূত্রে পাওয়া। পরবর্তীকালে কোমতে, জন স্টুয়ার্ট, মিল-এও নারীর প্রতি আধ্যাত্মিক অনুরক্তি আভাসিত হয়েছে। নারী সম্পর্কে পুরুষের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করার এবং যুগ-যুগ প্রসারী নির্মম আমানুষিকতা থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসেন ভারত উপমহাদেশের রামমোহন ও বিদ্যাসাগর এবং নরওয়ের ইবসেন– A Doll's House গ্রন্থের প্রণেতা। তাছাড়া মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে নারীর যে নতুন মূল্যায়নের প্রয়াস সূচিত হলো তা আরো পরিপূর্ণতা লাভ করল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে। সুরেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল প্রমুখ কবির মধ্যেও আমরা নারী সম্পর্কে পাই অকৃত্রিম অনুভূতির পরিচয়।

কিন্তু প্রসঙ্গের বিচারে নজরুলের 'নারী' নতুন না হলেও কাব্য বিচারে এর অনন্যতা স্বীকার করতেই হবে। এর রচনায় নজরুল পুরোনো ও গতানুগতিক পথে চলেননি– নারীকে সম্মান দেখানোর অভিপ্রায়ে উচ্ছ্বাসময় বাকজাল বিস্তার করার চেষ্টাও নেই তাঁর। প্রধানত যুক্তিতর্কের সাহায্যে নজরুল এতে নারীর মূল্য নিরূপণ করেছেন। নারীকে বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে, তার ব্যথা-বেদনা, বঞ্চনা, কর্ম, সাধনা, ত্যাগ, সৌন্দর্য বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করে তার সামগ্রিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী/পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি আপন অন্তর হতে'– উক্তির মধ্যে নারীর যে স্নিগ্ধ সৌম্য রূপায়ণ তাতে তার আংশিক পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। অন্যদিকে নজরুল তাঁর কবিতার সূচনাতে নারী-পুরুষের সাম্য ঘোষণা করে ধীরে ধীরে মেলে ধরেছেন নারীর এমন একখানি ছবি যাতে নারীর প্রতি সমাজের অবিচারই যে স্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠেছে এবং নারীর নীরব ত্যাগ ও সহিষ্ণুতাই ভাষা পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তার চলার পথের বিঘোষিত নির্দেশনাও তিনি দিয়েছেন।

নজরুল দেখিয়েছেন, যে নারী সৃষ্টির অর্ধেক স্থান জুড়ে আছে। তার প্রতি পুরুষের মনোভাবটি যেমন অযৌক্তিক তেমনি হাস্যকর। একদিকে স্বার্থান্ধ পুরুষ জগতের যাবতীয় মহান সৃষ্টির গৌরব নিঃশেষে আত্মসাৎ করতে চেয়েছে। অন্যদিকে সমস্ত দোষ ও পাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে দুর্বল নারী জাতির স্কন্ধে। নজরুল স্পষ্ট উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, নারী জাতি সমাজের গলগ্রহ তো নয়ই বরং পুরুষের কর্মে সে সর্বদা সহযোগিতাই করেছে এবং জগতের শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারও অবদান রয়েছে।

শস্যক্ষেত্র উর্বর হল, পুরুষ চালাল হল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে'
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে।

নারীকে 'নরককুণ্ড' বলে আখ্যায়িত করে আদিপিতা আদমের স্বর্গচ্যুতি তথা সমগ্র মানবজাতির অধঃপতনের জন্যে চিরকাল নারীকেই দায়ী করা হয়েছে। অথচ প্রথাগত সংস্কারের দাসত্বমুক্ত কবি এর ভেতরকার প্রকৃত সত্যকে অনাবৃত করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, পুরুষের কামনার ইন্ধন নারী নয়– প্রবৃত্তি শয়তান এবং নারী-পুরুষ উভয়কেই সে প্ররোচিত করতে পারে। তাই কবির সত্য ঘোষণা:

বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।

নারীর দেহ সুষমা যুগে-যুগে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছে। কবি নজরুলও তার ব্যতিক্রম নন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে নারী সৌন্দর্যের অপরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষযোগ্য:

স্বর্ণ রৌপ্যভার
নারীর অঙ্গ পরশ লভিয়া হয়েছে অলঙ্কার।

পুরুষ নারীকে হেয় জ্ঞান করলেও নজরুল এ কথা গোপন করতে চেষ্টা করেননি যে–

নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শরদ হইল গান।

নারীর বঞ্চনা দরদি কবির প্রাণের তারে আঘাত হানে, কেননা তিনি দেখেছেন পুরুষ যেন কেবল জন্মসূত্রেই পৃথিবীর বুকে তার গৌরব পতাকা উড্ডীন করে চলেছে। পুরুষের ত্যাগের কথা ইতিহাসের পাতা ও স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে অমর অক্ষরে লিখিত হয়ে থাকে কিন্তু সেই সঙ্গে যে নারীর আত্মত্যাগের কাহিনি মনে রাখেনি কেউ।

লেখক: শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও গীতিকার

নজরুল কাব্যে প্রেম

আতিক আজিজ

মানুষের শক্তি অসীম, তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বিচিত্র সুর- পুনরাবৃত্তিতে ধরা পড়ে তার দুর্বলতা। নব নব সুর ও স্বর-বৈচিত্র্যে রূপ লাভ করে মানুষের সৃজনীশক্তি। এই শক্তিরই নাম প্রতিভা। এই শক্তি যার যত বেশি, সে তত প্রতিভাবান। প্রতিভাবানের মনের পরিধি বহুধা ও ব্যাপকতর– তার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয় নানা সুর। বিশুদ্ধ বাংলায় এই শক্তিরই বিশেষণ হচ্ছে 'নব নব উন্মেষশালিনী'। কাজী নজরুল ইসলাম অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী তাঁর রচনার পরিধি বহু বিস্তৃত ও বহুমুখী, তাতে ঘটেছে নানা বিচিত্র সুরের সমাবেশ।

কবি নজরুলের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

জাতীয় কবির ভূমিকা তিনি সার্থকভাবেই পালন করেছেন, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মানব মনের চিরন্তন আকুলি-ব্যাকুলি, প্রেম-বিরহ, ব্যথা-বেদনাও তাঁর লেখনিতে সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন।

Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. কবি কণ্ঠের এই বাণীর মধ্যে চিরন্তন সত্য শুধু ধ্বনিত নয়, কালের অক্ষয় পটে বিধৃত হয়ে রয়েছে বলা যায়। কালের কণ্ঠে নজরুল এমনি বহু হৃদয়-বেদনার রঙে রাঙা গানের মালা পড়িয়েছেন এবং কাব্যে দিয়েছেন প্রেম-বিরহের মধুময় মুহূর্তকে রূপ। বলাবাহুল্য, সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুল বেঁচে থাকবেন প্রেমের ও ব্যথা-বিরহের কবি হিসেবেই। কবিতা ও সংগীতে তাঁর ছন্দ ও ভাষায় যেমন হয়েছে অদম্য ও অগ্নিস্রাবী তেমনি তাঁর প্রেম-বিরহের সংগীতের ছন্দ ও ভাষা হয়েছে চোখের জলে সিক্ত ও পুষ্প-কোমল। তাঁর হৃদয় বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে প্রকৃতি– বাংলা দেশেরই প্রকৃতি। প্রকৃতির প্রতীক দিয়েই তিনি মানব মনের চিরন্তন বিরহ-বেদনাকে দিয়েছেন রূপ, তাই তা হয়েছে অধিকতর মর্মস্পর্শী। তাঁর সুবিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতাও অসার্থক হতো যদি তাতে শুধু বিদ্রোহ ও ভাঙনের কথাই থাকত। বিদ্রোহীও মানুষ তাই তাঁর মুখেই শোভা পায়:

মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী,
আর হাতে রণতুর্য।

এই বিদ্রোহী মানুষের মুখে যখন আমরা শুনি:

আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা,
ব্যথা সুনিবিড়
চিত চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর থর থর
প্রথম পরশ কুমারীর।
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি,
ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার
কাঁকন চুড়ির কন কন
আমি চির শিশু চির কিশোর,
আমি যৌবন ভীতু পল্লীবালার আঁচল
কাঁচলি নিচোর।

তখন বিদ্রোহীর প্রচণ্ড মূর্তি ভুলে গিয়ে আমরা আমাদের চির পরিচিত রক্ত-মাংসে গঠিত মাটির মানুষকে দেখতে পাই, চিনতে পারি। এ না হলে বিদ্রোহী হ'ত অতি মানুষ, না হয় বড়ো জোর খ্যাতি মানুষ। কবির প্রতিভা ও পরিমিতি জ্ঞান এই ভাবে 'বিদ্রোহী' কে চিরন্তন মানুষ ও কবিতাকে সার্থক কবিতা করে তুলেছে।

কবি নিজে সকল মানুষ এবং তাঁর রচনায় সর্বত্র ফুটিয়ে তুলেছেন সবল মানুষকে। কাব্যে, সংগীতে, গদ্যে সর্বত্র জয় ঘোষণা করেছেন তিনি সবল মনুষ্যত্বের। তাঁর প্রেমে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ আছে, কিন্তু ন্যাকামি নেই। মান, অভিমান, রাগ, দ্বেষ কিছুই তার প্রেম থেকে বাদ পড়েনি; কিন্তু এই সবকেই রূপ দিয়েছেন তিনি সবল মানুষের মতোই। তাঁর প্রথম দিকের প্রেমের কবিতাগুলোর মধ্যে 'পূজারিণী' নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রেম-বঞ্চিত কবির হৃদয়-মথিত বেদনার ইতিহাস। কিন্তু কবি হননি উদ্ভ্রান্ত, হারাননি আত্মপ্রত্যয়, কবির প্রেম সর্বগ্রাহী, কবি চান প্রেয়সীর অখণ্ড প্রেম, 'খণ্ডিতা' র খণ্ড প্রেম নিয়ে কবি-চিত্ত তৃপ্তি পায়নি, তাই খণ্ডিতার উদ্দেশ্যে তার ওষ্ঠে ফুটে উঠেছে নির্মম বিদ্রূপ ও কঠোর জিজ্ঞাসা:

ছিল আশা ছিল শক্তি বিশ্বটারে টেনে,
ছিঁড়ে তব রাঙা পদতলে ছিন্ন রাঙা পদ্মসম পূজা দেব এনে।
কিন্তু হায়! কোথা সেই তুমি? কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সেই নাড়ী-ছেড়া প্রাণে প্রাণে টান?

কিন্তু কবির এই অখণ্ড ও সুগভীর ভালোবাসার মর্যাদা দেয়নি প্রেয়সী। স্ফটিক-স্বচ্ছ কবি চিত্তকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়, সম্ভব নয়– তাই তাঁর এই রোষ-কষায়িত বিদ্রূপ:

এ তুমি আজ সে-তুমি তো নহে;
আজ হেরি-তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও চাইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী।
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকী
দুর্ভাগিনী! দেখে হেসে মরি! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?

কবির দুর্লভ প্রেমকে যে নারী এভাবে লাঞ্ছিত করে সে সত্যই দুর্ভাগিনী বৈ কি! অভিশাপ কবিতায় এই দুর্ভাগিনীকে কবি

রীতিমতো খোটা দিয়ে অভিশাপ দিয়েছেন বেশ কঠোরভাবে:

স্বপন ভেঙে নিশুত রাতে জাগবে হঠাৎ চমকে
কাহার যেন চেনা ছোঁয়ায় উঠবে ও বুক ছমকে
জাগবে হঠাৎ চমকে!
ভাববে বুঝি আমিই এসে
বসনু বুকের কোলটি ঘেঁষে
ধরতে গিয়ে দেখবে যখন
শূন্য শয্যা! মিথ্যা স্বপন!
বেদনাতে চোখ বুজবে
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

ভালোবাসা অন্ধ। কবির ভালোবাসার গভীরতা বেশি বলে তাঁর ভালোবাসা অধিকতর অন্ধ। কবি নিজের মন দিয়ে প্রেয়সীর মনকেও বিচার করেছেন। না হয় তিনি অনয়াসেই বুঝতে পারতেন, যে প্রেয়সী তাঁর ভালোবাসাকে অপমান করতে পারে, তার পক্ষে কবিকে বে মালুম ভুলে গিয়ে নতুন প্রেমিকের নবতর প্রেমে মগ্ন হয়ে থাকা বা শান্তিতে জীবনযাপন করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

পিছু ডাক কবিতাতেও কবি নিজের কল্পনা দিয়েই প্রেয়সীর প্রতি প্রেম জিজ্ঞাসা নিবেদন করেছেন:

সখি! নতুন ঘরে গিয়ে আমায় পড়বে কি মনে?
সেথায় তোমার নতুন পূজা নতুন আয়োজনে
প্রথম দেখা তোমার আমায়
যে গৃহ-ছায় যে আঙিনায়,
যেথায় প্রতি ধূলি কণায়,
লতাপাতার সনে।
নিত্য চেনার চিত্ত রাজে চিত্ত আরাধনে,
শূন্য সে ঘর শূন্য এখন কাঁদছে নিরজনে।

আমরা জানি, এ শূন্য গৃহের কান্না নয়, এ বিরহকাতর কবি হৃদয়েরই নীরব অশ্রুপাত। সব শিল্পের মূলে রয়েছে প্রেমের প্রেরণা। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমও বিস্তৃততর ও বহুক্ষেত্রে প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু তাঁর সূচনা নারী-প্রেম, তাই কবি মাত্রই প্রেমিক। তাঁর কাব্যজীবনের গোড়াতেই নজরুলও জানিয়েছেন এই স্বীকারোক্তি:

তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ-সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।
আপন জেনে হাত বাড়ালো–
আকাশ বাতাস প্রভাত আলো,
বিদায় বেলার সন্ধ্যা তারা
পূবের অরুণ রবি–
তুমি ভালোবাসো বলে ভালোবাসে সবি।

একজনের ভালোবাসা বিশ্বের ভালোবাসা হয়ে কবি চিত্তকে মাধুর্যমণ্ডিত করে দিয়েছে। এর ফলেই ঘটে কবিচিত্তের স্বপ্নভঙ্গ– কবি মানসের ঘটে নব জাগরণ ও আত্মোপলব্ধি। তাই কবি বলেছেন:

আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায়।

কিন্তু তারচেয়ে বড়ো কথা আত্মসমর্পণ– আত্মসমর্পণ ছাড়া গভীর ভালোবাসার তৃপ্তি নেই। কবির কাছে দিয়ে যে সুখ তার কাছে পেয়ে যে সুখ, সিন্ধুর কাছে বিন্দুর মতোই। তাই বিদ্রোহী কবি বলেছেন:

হে মোর রাণী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে।

সপরিবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

তিনি যদি কবি না হয়ে শুধু বিদ্রোহী হতেন তাহলে কখনো হার মানতেন না। এই মানার মধ্যেই তাঁর কবি প্রতিভার সার্থকতা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের কবি। তাই মালঞ্চের মালাকর হওয়াই তাঁর পক্ষে চরম আত্মসমর্পণ, কিন্তু নজরুল ব্যথার কবি, চোখের জলের কবি, তাই তার আত্মসমর্পণ:

আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত রথের চূড়ে,
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তৃণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়ন জলে ভেসে।

ভালোবাসার রণে পরাজয়ই তো সত্যিকার জয়! বিজয়ী হলেও এখানে চোখ অশ্রু ছলছল করে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ, এই প্রকৃতির সঙ্গে রয়েছে আমাদের মনের ও ভাবের নিবিড় যোগ। আমাদের প্রেম মিলন বিরহের উপর প্রকৃতির ছায়া না পড়েই পারে না। এই প্রকৃতির মাধ্যমেই আমাদের কবিরা তাদের হৃদয়ানুভূতিকে রূপ দিয়েছেন বারে বারে। চৈতী হাওয়া কবিতায় নজরুলও তাঁর হৃদয়ের বিরহ বেদনাকে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে এক অপূর্ব ভাষা মূর্তি দিয়েছেন। এই কবিতাটিতে তাঁর ভাষা পেয়েছে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা।

শূন্য ছিল নিতল দীঘির কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল?
আঁধার দীঘির ভাঙলে বুক-
কোন পূজারী নিল ছিঁড়ে? ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আছে কোন দেবতার কোন সে পাষাণ তল?

ব্যথা ও বিদ্রূপ মিশ্রিত শেষের দুইটি লাইন গভীর অর্থপূর্ণ। এই কবিতাটির প্রত্যেকটি স্তবকে শব্দচয়ন ও প্রকাশ– শক্তির যে অসাধারণ নৈপুণ্য ও তাঁর যে সচ্ছন্দ গতির পরিচয় ফুটে উঠেছে তার তুলনা বাংলা সাহিত্যের খুব বেশি নেই।

পারাবারের ঢেউ দোলানী
হানছে বুকে ঘা।
আমি খুঁজি ভিড়ের মাঝে চেনা
কমল পা।

চমৎকার নয় কি? কবি-চিত্তের আবেগ-রঞ্জিত ভাষা প্রকৃতিকে করে তুলেছে সজীব ও মুখর:

পড়ছে মনে টগর চাঁপা বেল
চামেলী যুঁই
মধুপ দেখে যাদের শাখা
আপনি যেত নুই।
হাসতে তুমি দুলিয়ে ডাল,
গোলাপ হয়ে ফুটতু গাল।
গোলাপ হ'ত টলমলাতে ভুঁই।

নজরুল প্রেমের গান লিখেছেন, কবিতাও কম লেখেননি। গোপন প্রিয়া গানের আড়াল এ মোর অহংকার ভীরু তুমি মোরে ভুলিয়াছ হিংসাতুর প্রভৃতি বহু কবিতায় প্রেম বিরহের বহু চিত্রই কবি এঁকেছেন। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ কবিতায় প্রিয় মিলনের অনির্বচনীয় আনন্দের পরিবর্তে মান-অভিমানের পরিচয়ই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। গানের আড়াল কবিতার একটি স্তবক এই:

হয় তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয় তো কহিনি কথা,
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস মিছে তার আকুলতা?
হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার তাহারি প্রতিধ্বনি
কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রণরণি,
উপকূলে বসে শুনছে সে সুর বোঝ নাই তার মানে?
বেঁধেনি হৃদয়ে সে সুর দুলেছে দুল হয়ে শুধু কানে?

বলাবাহুল্য এই সবই অভিমানের কথা। কিন্তু অভিমান তো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। তাই মন থেকে সমস্ত মান-অভিমান ঝেড়ে ফেলে এ মোর অহংকার কবিতায় কবি বলতে পেরেছেন:

নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার,
তোমায় আমি করব সৃজন এ মোর অহংকার!
এবং চাই না দেবীর দয়া যাচি প্রিয়ার আঁখিজল,
একটু দুখে অভিমানে নয়ন টলমল।

নজরুলের প্রেম মানুষের এই চিরন্তন আঁখিজলেই খুঁজেছে সার্থকতা এবং পেয়েছে চরিতার্থতা। ভীরু কবিতায় কবি কিশোরী চিত্তে নব এক অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন। এই কবিতার প্রতি স্তবকে প্রণয়-ভীতু স্পর্শ কাতর কিশোরী মনের ভালোবাসা মূর্তিমান হয়ে রূপ পেয়েছে:

আমি জানি তুমি কেন কহ না'ক কথা।
সেদিনো তোমার বনপথে যেতে
পায়ে জড়াত না লতা।
সেদিনো বে-ভুল ভুলিয়াছ ফুল
ফুল বিঁধিতে গো বিঁধেনি আঙুল,
মালার সাথে যে হৃদয়ও শুকায় জানিতে না সে বারতা
জানিতে না, কাঁদে মুখর মুখের আড়ালে নিঃসঙ্গতা।
আমি জানি তুমি কেন কহ না'ক কথা।

যেসব কবিতার কথা উল্লেখ করা হলো এগুলো লেখা হয়েছে অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে, যখন আবেগ উদ্বেগে নজরুল চিত্ত ভরপুর, জীবন যখন তাঁর রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত, আলোড়িত ও বিপর্যস্ত তখন। কাজেই গভীরতর আত্মজিজ্ঞাসা ও স্বস্তির প্রেমের সুস্নিগ্ধ ও মধুরতর স্পর্শে এসব কবিতা শান্ত সৌন্দর্যের মহিমা লাভ করেনি। সেই মহিমা লাভ করেছে তাঁর সংখ্যাতীত গানে– যা রচিত হয়েছে এই কবিতাগুলোর অনেক পরে; যখন কবির জীবনে ফিরে এসেছে শান্তি ও ধৈর্য এবং আবেগ যখন পরিণত হয়েছে ধ্যানে।

নজরুলের প্রেমের গান সংখ্যায় এত বেশি এবং তাতে প্রেমের এত বিচিত্র সুর ধ্বনিত হয়েছে যে তাঁর সম্যক আলোচনা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। গানে শুধু জ্ঞান নয় কবির ভাষাও পেয়েছে এক শিল্পরূপ সুর-বৈচিত্র্যের তো কথাই নেই। এসব গানে এক অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে এক একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তাঁর এক-একটি লাইন যেন এক একটি চিত্র– শুধু চিত্র নয়, চিত্রের সঙ্গে ঘটেছে ভাবের সমন্বয়।

লেখক: সম্পাদক, সাপ্তাহিক কাঁচামাটি

১৭ বছরে দুই গিনেস রেকর্ড

বাংলাদেশি কিশোর মাহমুদুল হাসান ১৭ বছর বয়সেই দুবার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছে। মাগুরা জেলার এই অদম্য কিশোর বাস্কেট বল ফ্রি স্টাইল আর্মরোলিং-এ স্বীকৃতি পায় এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে। গিনেস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার পর সম্প্রতি মাগুরায় স্থানীয় সাংবাদিকদের বিষয়টি জানায় মাহমুদুল। ভবিষ্যতে সে ফ্রি স্টাইলার হিসেবে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চায় বলে জানায়।

এর আগে ২০১৮ সালের আগস্টে ফ্রি স্টাইল ফুটবল আর্মরোলিং-এ গিনেস বুকে নাম লেখায় মাহমুদুল। মাহমুদুল মাগুরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে মেকানিক্স টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। মাগুরা সদর উপজেলার হাজিপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য সোহেল রানা এবং গৃহিণী মঞ্জুয়ারা খানমের সন্তান মাহমুদুল। ২০১৮ সালে ফুটবলে এক মিনিটে ১৩৪ বার আর্মরোলের মাধ্যমে প্রথম গিনেস রেকর্ড গড়ে। এবার বাস্কেট বলে এক মিনিটে ১৪৪ বার আর্মরোল করে দ্বিতীয়বারের মতো জায়গা করে নেয় গিনেস বুকে।

মাহমুদুল হাসান বলেন, দ্বিতীয়বার রেকর্ড গড়তে তার খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। তবে প্রথম রেকর্ড করার আগে প্রায় চার মাস ধরে প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত অনুশীলন করতে হয়েছিল। আরো রেকর্ড করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এই কিশোর।

প্রতিবেদন: ইশরাত জাহান

২৮শে মে: নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস

মিতা খান

পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম শব্দ হচ্ছে 'মা'। বংশানুক্রম ধারা টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব প্রাকৃতিকভাবেই বর্তায় নারীর ওপর। কারণ নারীর পূর্ণতা আসে মাতৃত্বে। প্রতিবছর সারাবিশ্বে ২১ কোটি নারী গর্ভবতী হয় এবং ২ কোটিরও বেশি নারী গর্ভজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে। এদের মধ্যে ৮০ লাখের জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই জটিলতা অপেক্ষাকৃত ধনীদের তুলনায় প্রায় ৩০০ গুণ বেশি। মাতৃস্বাস্থ্য, নিরাপদ প্রসব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, মা-পরিবার ও সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতকরণ লক্ষ্যে ১৯৮৭ সাল থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন দেশে ২৮শে মে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' হিসেবে পালিত হয়। এ দিবসটি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক নারী স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালিত হলেও মাতৃস্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব ও এর কার্যকারিতা অনুধাবন করে ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালিত হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য, নিরাপদ মাতৃত্বকে নারীর অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে মা ও নবজাতকের মৃত্যুহার কমিয়ে আনা। গর্ভবতী নারী গর্ভকালীন সেবা, নিরাপদ প্রসবের জন্য যাবতীয় সেবা এবং প্রসব-পরবর্তী সেবা পাওয়ার সব অধিকার নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে গর্ভধারণের ৪২ দিন থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত দুর্ঘটনা ছাড়া মায়ের মৃত্যুকে মাতৃমৃত্যু বলা হয়। মৃত্যুর পরোক্ষ কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে– ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্যানসার, স্থূলতা, যক্ষ্মা, রক্তস্বল্পতা, হেপাটাইটিস বি, ২০ বছরের কম বা ৩৫ বছরের বেশি বয়সে সন্তান নেওয়া, এইচআইভি এইডস, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি। ইউএনএফপি-এর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত এক সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে প্রসবজনিত ফিস্টুলায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রতি হাজারে ১ দশমিক ৬৯ জন। আর এ ফিস্টুলার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হলো জরুরি প্রসূতি সেবাপ্রাপ্তি ও দক্ষ ধাত্রীর অভাব। মাতৃস্বাস্থ্য এবং নবজাতকের মৃত্যুহার কমিয়ে আনা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি)-এর অন্যতম একটি অংশ। এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে সফল। ২০০৫ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল প্রতি লাখে ২৩৩ জন, ২০১৪-তে সেই হার ১৯৪ জন। এমডিজি'র আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে ১৪৩-এ নামিয়ে আনা এবং এমডিজি'র আওতায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৭০ জন। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যু ১৩৭ জনে নেমে এসেছে।

বর্তমান সরকার নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে অনেক উন্নয়নশীল কাজ করে যাচ্ছে। যেমন: মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাসে উন্নীতকরণ এবং সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার ১.৫ শতাংশে কমিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়াও সরকারের উদ্যোগে ১৩,১৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকে বিনামূল্যে মাতৃসেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের একটি, যা অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করছে।

দেশের নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ব্যবস্থা, নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, পরিবেশ উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের মডেল হিসেবে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০১০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের এমডিজি পুরস্কার দেওয়া হয়। নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস আমাদের চাওয়া– সবার মধ্যে সচেতনতা বাড়বে, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হবে। সব শ্রেণির মানুষ এই অধিকার পাবে, তাহলেই নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালন করা সার্থক হবে।

লেখক: কপি রাইটার, ডিএফপি

তীর-প্রথম আলো কৃষি পুরস্কার ২০১৮

শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো সনদ না থাকলেও আছে ধান নিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবন। সংকরায়ণ করে একের পর এক নতুন ধান উদ্ভাবন করেন নূর মোহাম্মদ। তার বাড়ি রাজশাহীর তানোর উপজেলার গোল্লাপাড়া গ্রামে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন নূর মোহাম্মদ। বরেন্দ্রভূমিতে প্রায় প্রতিবছরই খরায় নষ্ট হয়ে যায় ধান। সেই ধান রক্ষা করতেই কাজে লেগে যান নূর মোহাম্মদ। তাঁর মাটির ঘরটাকে বানিয়ে ফেলেন গবেষণাগার। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান হেলাল উদ্দিনের সাহচর্য পান তিনি। সেখানে হাতে-কলমে শেখেন অনেক কিছু। এ পর্যন্ত সংকরায়ণের পর নূর মোহাম্মদের কৌলিক সারির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০০। সর্বশেষ তিনি একটি নতুন সারি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর দাবি, দেশে প্রচলিত বোরো ধান বপন থেকে শুরু করে কাটা পর্যন্ত ১৪০ দিন লাগে। তার উদ্ভাবিত এই ধান বোরো মৌসুমে বপন থেকে কাটা পর্যন্ত ১৩০ দিন লাগে। তিনি খরাসহিষ্ণু এই ধানের সারির নাম দেন এনএমকেপি-৫। এনএমকেপি'র অর্থ হচ্ছে-'নূর মোহাম্মদ কৃষি পরিষেবা'। এনএমকেপি ৫-এর বিঘাপ্রতি ফলন ২৫ মণ। এই ধানের বিশেষত্ব হচ্ছে, পাকার পরও পাতা সবুজ থাকে। গাছ মজবুত। খরাসহিষ্ণু। পোকামাকড় ও রোগবালাই অনেক কম। এটি আমন মৌসুমেও হয়। এর জীবনকাল হয় ১১০ থেকে ১১৫ দিন। এ ধান বোরো মৌসুমে ২৫ মণ ও আমন মৌসুমে ১৮ মণ পর্যন্ত হয়। এই জাতের ধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরুর আগেই ঘরে তোলা যাবে। অন্য ধানের চেয়ে ১০ দিন আগে ওঠার কারণে সেচের খরচ কম হয়। আগাম ওঠার কারণে ভালো বাজার মিলে। এর চাল চিকন। ভাত খেতে ভালো লাগে। নূর মোহাম্মদ তাঁর যে পাঁচটি জাত স্বীকৃতি পাওয়ার মতো বলে মনে করেন, সেগুলো হলো-এনএমকেপি-১ থেকে এনএমকেপি-৫ পর্যন্ত। তিনি দেশের প্রচলিত ধানের জাতকে উজ্জীবিত করে তার জীবনকাল কমিয়ে এনেছেন। কোনোটির ফলন বাড়িয়েছেন। খরাসহিষ্ণু জাতের উদ্ভাবন করেছেন। বীজতলায় ফেলা থেকে শুরু করে আমন ১১০ থেকে ১১৫ দিনের মধ্যে কাটা যায়। বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য উপযোগী করে এই ধান উদ্ভাবন করেছেন তিনি। এই ধান ১৫ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি না পেলেও খরা মোকাবিলা করে ভালো ফলন দিতে সক্ষম। এর ফলন বিঘায় ২০ থেকে ২১ মণ পর্যন্ত হয়। সবচেয়ে স্বল্প জীবনকালের খরাসহিষ্ণু বোরো ধান উদ্ভাবন করেছেন বলে নূর মোহাম্মদ দাবি করেন। এই ধানের নাম দিয়েছেন এনএমকেপি-১০৩। সুগন্ধি এ ধান আমন মৌসুমেও হয়। কৃষি উৎপাদনে সাফল্যের জন্য নূর মোহাম্মদ ২০০৫ সালে পান রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক। সেরা কৃষি উদ্ভাবন ক্যাটাগরিতে তীর-প্রথম আলো কৃষি পুরস্কার ২০১৮ পেয়েছেন এই কৃষিবিজ্ঞানী নূর মোহাম্মদ।

প্রতিবেদন: সাফায়েত হোসেন

গ্রামে শহরের সুবিধা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম

এম এ খালেক

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয়বারের মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। এ নিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার টানা তৃতীয়বার এবং মোট চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। আর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে পঞ্চমবারের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোনো নেতা বা নেত্রী বা দলের পক্ষে এত অধিক বার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্তি সম্ভব হয়নি। এদিকে বিবেচনা করলে এটি একটি অনন্য রেকর্ডও বটে। আওয়ামী লীগের আগের দু'মেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনাকালীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। প্রতিবারই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে তা নানা কারণেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। গত দশ বছরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর সাফল্য প্রদর্শন করেছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহারে তার প্রতিফলন ঘটানো হয়। নির্বাচনি ইশতেহারে বিগত ১০ বছরের অর্থনৈতিক সাফল্যের চিত্রকল্প অঙ্কন করা ছাড়াও নতুন করে কিছু অর্থনৈতিক অঙ্গীকার করা হয়েছে– যা উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্ময়করও বটে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের অধিকাংশ অর্থনৈতিক ইস্যুই উল্লেখ করার মতো। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বিস্ময়কর অঙ্গীকার হচ্ছে, শহরের সব সুবিধাকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া। অনেকেই এই অঙ্গীকারকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ বলছেন, সরকার গ্রামকে শহরে পরিণত করার লক্ষ্যে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ শহরের যেসব সুবিধা রয়েছে তা গ্রামেও পাওয়া যাবে। এতে চিরায়ত গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগবে। সরকার গ্রামের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে শহুরে সুবিধা সেখানে সঞ্চালিত করার চেষ্টা করছে। এতে গ্রামের চিরায়ত রূপের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।

নির্বাচনি ইশতেহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার হচ্ছে 'আমার গ্রাম-আমার শহর'। তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাসহ শহরে প্রাপ্ত সব সুবিধাই গ্রামে সম্প্রসারিত করা হবে। সরকারের এই নির্বাচনি অঙ্গীকার অভিনব, চমকপ্রদ এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এতে কোনো সন্দেহ নেই। নির্বাচিত নতুন সরকার গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'আমার গ্রাম-আমার শহর' প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। একইসঙ্গে শহরে পাওয়া যায় এমন সব আধুনিক সুবিধা গ্রামের মানুষ স্ব-স্ব এলাকায় বসেই পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। একটি সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। যার ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যেই শতবর্ষী ডেল্টা প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার সঙ্গে গ্রামকে শহরে পরিণত করার কার্যক্রমকে যুক্ত করা হবে। সরকার আশা করছে, এই কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে আগামী ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আগামী ৫ বছরে দেশে ১ কোটি ২৮ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এটা সরকারের অন্যতম নির্বাচনি অঙ্গীকার। এ আগামীতে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হতে যাচ্ছে তার বেশিরভাগই পল্লি এলাকায় গড়ে তোলা হচ্ছে। এসব বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে তাতে অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘিরে শ্রমিক কলোনি গড়ে উঠবে। দোকান-পাট গড়ে উঠবে। ফলে সেখানে এমনিতেই শহরের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সাধিত হবার আগে বেশিরভাগ মানুষই কৃষি-শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য শ্রমিক কলোনি গড়ে উঠে। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশন চলছে। বাংলাদেশেও এর ঢেউ লাগতে শুরু করেছে। আগামীতে শিল্প-কারখানার ক্ষেত্রে কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে প্রযুক্তি নির্ভরতা

বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার যেসব মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে তা সম্পন্ন হলে দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হলে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হবে। উল্লেখ্য, এসব বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বেশিরভাগই পল্লি এলাকায় স্থাপিত হচ্ছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ কৃষিজমিকে সুরক্ষা করা এবং কৃষিপণ্যনির্ভর শিল্প স্থাপনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। যাতে পল্লি এলাকায় যে কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয় তা এসব শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামগুলো এক একটি ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমশ কৃষিনির্ভরতা কাটিয়ে শিল্পের দিকে ধাবিত হচ্ছে। গ্রামের আনাচে-কানাচে ছোটো-বড়ো নানা ধরনের শিল্পকারখানা লক্ষ করা যায়। মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি খামার, গরু-ছাগলের খামার এখন অনেক গ্রামেই দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত হচ্ছে জনশক্তি রফতানি। প্রতিবছর এই খাত থেকে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আহরিত হচ্ছে। যারা বিদেশে চাকরির জন্য গমন করছেন তাদের বেশিরভাগই গ্রামের মানুষ। তারা বিদেশে গিয়ে পরিশ্রম করে অর্থ পাঠাচ্ছে। আর দেশে অবস্থানকারী লোকাল বেনিফিশিয়ারিরা সেই অর্থ ব্যবহার করে তাদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। কয়েক বছর আগে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। আগে

যেখানে মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা ছিল ১২ শতাংশ এখন তা বেড়ে হয়েছে ২০ শতাংশ। এই যে মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এদের বেশিরভাগই গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামের মানুষের আচার-আচরণ এখন পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামের মানুষের ব্যয়ের সামর্থ্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরের বিলাসজাত সামগ্রির বেশিরভাগই এখন গ্রামের উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত পরিবারে লক্ষ করা যায়। কালার টেলিভিশন, ফ্রিজ, ওভেন এখন গ্রামীণ পরিবারেও দেখতে পাওয়া যায়। কম্পিউটার, ইন্টারনেট এখন গ্রামের ছেলেমেয়েরাও ব্যবহার করে। কাজেই শহরের সব নাগরিক সুবিধা গ্রামে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ কল্পলোকের রূপকথা নয়, বাস্তবতা। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের গ্রামগুলো অনেকটাই শহুরে রূপে পরিবর্তিত হয়েছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গ্রামের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শহর ও গ্রামের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রতিটি উপজেলা এখন

শহরে পরিণত হয়েছে। কোনো কোনো গ্রামও এখন শহরের মতোই উন্নত এবং আধুনিক হয়েছে। অনেক গ্রামেই এখন বিদ্যুৎ এবং উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। ১৯৭১ সালে অর্থাৎ বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। সেসময় উৎপাদিত হতো প্রায় ১ কোটি টন। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে তিন গুণেরও বেশি। গত বছর চাল উৎপাদিত হয়েছে ৩ কোটি ৬২ লাখ টন। বাংলাদেশ এখন খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশ মাছ এবং হাঁস-মুরগি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। চাষকৃত মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। অচিরেই বাংলাদেশ এক্ষেত্রে বিশ্বে শীর্ষ স্থান দখল করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ কৃষি যান্ত্রিকায়নের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের কৃষি খাতের সম্ভাবনাকে যদি সঠিকভাবে এবং পরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগানো যায় তাহলে আগামী ১০০ বছরের বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা স্থানীয়ভাবেই মেটানো সম্ভব বলে কৃষি বিজ্ঞানিরা মনে করেন।

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ, যদিও আমরা শিল্পে অনেক উন্নতি সাধন করেছি। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ ছিল প্রায় সর্বাংশেই একটি কৃষিনির্ভর দেশ। বঙ্গবন্ধু ঠিকই জানতেন, শুধু কৃষির উপর জোর দিয়ে একটি দেশ কখনোই সত্যিকারের উন্নয়ন অর্জন করতে পারে না। তাই তিনি শিল্পায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু দেশের কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কৃষি খাতের জন্য সমবায় পদ্ধতির চাষাবাদের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি সমবায় ভিত্তিক চাষ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা রোধ করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশে এখনো যে সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিকাজ করা সম্ভব তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে– 'কমিউনিটি বেইজড দাউদকান্দি ফিশ কালচার'। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন কার্যক্রম (শিসউক) নামে একটি বেসরকারি সংস্থার দাউদকান্দিতে প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে। বর্ষা এবং তৎপরবর্তী কয়েক মাস যেসব জমি পানির নিচে পড়ে থাকত সেগুলোতে তারা সমবায়ের মাধ্যমে মাছ চাষ করছে। এতে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জীবন ধারণসহ সকল প্রকার মৌলিক অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য

দূরীকরণের লক্ষ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের ব্যবস্থাকরণ, কুটির ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শিক্ষার বিকাশের অঙ্গীকার রয়েছে। বঙ্গবন্ধু সারাজীবন সাধারণ মানুষের মঙ্গল চিন্তা করেছেন। তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনায় সেই চিন্তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যেহেতু রাষ্ট্র খুব ভালো ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে পারে না তাই কিছু বিষয় রাষ্ট্রের হাতে থাকলেও বেশিরভাগ কাজ পরিচালিত হবে সমবায়ের ভিত্তিতে। মানুষজন একত্রিত হয়ে সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করবে। তারা যদি সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করে তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন সহজতর হবে।' তিনি গ্রামগঞ্জের জমি সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাতে আইলের কারণে যে বিশাল এলাকা চাষের বাইরে থেকে যায় তা না থাকে। জমিতে কোনো আইল থাকবে না। সবাই সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ করবে এবং উৎপাদিত ফসল থেকে নিজেদের জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে ফসলের ভাগ পাবে। রাষ্ট্র এই সমবায় সৃষ্টি করবে না ব্যক্তিরাই সমবায় সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্র সেখানে যে-কোনো ধরনের সহায়তা প্রদান করবে। গ্রামে মানুষের যে বসতবাড়ি আছে বঙ্গবন্ধু তার ব্যবহার নিয়েও ভেবেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, অনেকেই বিশাল বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন। তারা হয়ত সেখানে গাছপালা লাগাচ্ছে কিন্তু বাড়িগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বাড়িগুলো বিচ্ছিন্ন হবার ফলে প্রায়শই চুরি-ডাকাতির মতো ঘটনার শিকার হচ্ছে। এছাড়া এতে মানুষের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাই তিনি গুচ্ছ গ্রামের মতো প্রকল্পের চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। অর্থাৎ পুরো গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস না করে গ্রামেরই একটি অংশ বসবাসের জন্য নির্বাচন করা হবে। সেখানে গ্রামের অধিবাসীরা থাকবেন। তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। বসবাস স্থানে উন্নত সেনিটেশন ব্যবস্থা থাকবে। এতে গ্রামে বসবাসকারী মানুষের জীবনমান উন্নত হবে। তারা তুলনামূলক ভালো পরিবেশে উন্নত জীবন-যাপনে সক্ষম হবে। বসবাসের জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হবে তা সম্ভব হলে পাকা করা হবে। গ্রামের মানুষের মাঝে যাতে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পায় সেটাই ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর সেই অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। শহরের সুবিধা গ্রামে নিয়ে যাওয়াটা সেই উদ্যোগেরই অংশ বলা যেতে পারে।

সরকার গ্রামকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই উন্নয়নের ফোকাস গ্রামের উপর নিবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা যদি সত্যিকারার্থে গ্রামীণ অর্থনীতি এবং সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করতে চাই তাহলে বেশ কিছু পদক্ষেপ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নিতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতি এখনো অনেকাংশেই কৃষিনির্ভর। কৃষিতে যে পণ্য উৎপাদিত হয় তা দিয়ে নানা ধরনের প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপিত হতে পারে। আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রচুর সংখ্যক কৃষি ও নির্মাণ শ্রমিক পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই অদক্ষ এবং অপ্রশিক্ষিত। তাই এদের প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে। গ্রামে গ্রামে উন্নতমানের নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রগতি সাধন করেছে।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের কয়েকটি কাজ অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে। প্রথমেই প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামে গ্রামে গ্যাস লাইন স্থাপন করে জ্বালানি কাজে কাঠের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রত্যেক গ্রামে অন্তত একটি রাস্তা, যা মূল সড়ক হিসেবে পরিচিত তা পাকাকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামে যেসব পুকুর জলাশয় আছে তা সংস্কারের মধ্যমে মাছ চাষের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। কেনো ক্রমেই অপরিকল্পিতভাবে জলাশয় ভরাট করতে দেওয়া যাবে না। প্রত্যেক গ্রামে পর্যায়ক্রমে বহুতল বিশিষ্ট ফ্লাট বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে সরকারিভাবে তুলনামূলক স্বল্প সুদের ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

আগামীতে গ্রামই হবে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সূত্র। কাজেই কোনোভাবেই গ্রামকে অবহেলা করা যাবে না। শহরের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রায় পুরোটাই ইতোমধ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। এখন আমাদের গ্রামের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। সময়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার সেই উদ্যোগই গ্রহণ করছে। শহরকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হবে না বরং গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে শহুরে সুবিধা গ্রামে সঞ্চালিত করা হবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

আন্তর্জাতিক দমকল কর্মী দিবস

আগুন থেকে আলো, শিখা ও তাপের উৎপত্তি হয়। যা মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদান। আগুনের আবিষ্কার ও নিয়ন্ত্রণ মানুষের জীবনধারণকে পালটে দিয়েছে। নিত্যনৈমিত্তিক কাজে আগুনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। কিন্তু এই আগুনই কখনো কখনো হয়ে ওঠে ধ্বংসের কারণ। ১৯৯৮ সালের ২রা ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। সেই অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণ করতে গিয়ে পাঁচ দমকল কর্মী প্রাণ হারান। তাদের স্মরণে ১৯৯৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ই-মেইল বার্তার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে দিনটি পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর থেকেই বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর ৪ঠা মে সেই দমকল কর্মীদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক 'দমকল কর্মী দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও এ দিনটি পালিত হয়। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে দিবসটি পালন করে থাকে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর। দিনটিকে উপলক্ষ র‍্যালি বের করে। সেই সময় সকলে লাল ও সবুজ ব্যাজ ধারণ করে।

দমকল কর্মীরা মানুষের জীবন বাঁচাতে কাজ করেন। তাদের জীবন উৎসর্গ করে থাকে দেশের জনজীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে। জীবন বাজি রেখে তারা সাহসিকতার সাথে এ কাজ সম্পাদন করেন। আন্তর্জাতিক 'দমকল কর্মী দিবস' পালন করার মাধ্যমে বিশ্বের সকল মানুষের সামনে তাদের অবদানের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়। গতি, সেবা ও ত্যাগ হচ্ছে দমকল বাহিনী কর্মীদের মূলমন্ত্র। এই কর্মীরা অগ্নি নির্বাপণ, অগ্নি প্রতিরোধ, উদ্ধার, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, মুমূর্ষু রোগীদের হাসপাতালে প্রেরণ ও দেশি-বিদেশি ভিআইপিদের অগ্নি নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। শুধু তাই নয় সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের মাঝে অগ্নি নির্বাপণ ও প্রতিরোধ সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দমকল বাহিনীর কর্মীরা প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন করে থাকে। বাংলাদেশের দমকল বাহিনীর মিশন হচ্ছে– 'দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা'।

প্রতিবেদন: শাওন আহমেদ

বাংলাদেশে পরিযায়ী পাখি

মোহাম্মদ খালিদ হোসেন

পাখিরা প্রাণিজগতের মধ্যে একটি শ্রেণি। পৃথিবীতে হাজার হাজার প্রজাতির পাখি আছে। এসব প্রজাতি আবার একাধিক ভাগে বিভক্ত। সাধারণত পাখি দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন: দেশি ও পরিযায়ী পাখি।

শীতকালে ও মাঝে মধ্যে অন্য ঋতুতে বাংলাদেশে আসা কিংবা যাত্রাপথে কিছু দিনের জন্য বিরতি নেওয়া পাখিকে পরিযায়ী পাখি বলে। বাংলাদেশে পরিযায়ী পাখিদের বেশিরভাগই আসে উপমহাদেশের উত্তরাংশের পর্বতময় এলাকা অর্থাৎ হিমালয় বা হিমালয়ের ওপাশ থেকে। কিছু প্রজাতির পাখি আসে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল ও দূরপ্রাচ্য যেমন সাইবেরিয়া থেকে। সুতরাং ইউরেশিয়া থেকে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ায় অর্থাৎ দক্ষিণ দিকেই বিপুল সংখ্যক পাখি পরিযায়ী হয়। কয়েকটি প্রজাতি উত্তরমুখে এবং বাংলাদেশ হয়েই যাতায়াত করে। আবার কতকগুলো প্রজাতির পাখি আরো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে যাওয়ার পথে বাংলাদেশের মাটিতে নামে ও দু'একদিন থাকে। এরাই যাত্রাবিরতিকারী প্রজাতি। আরো কিছু পাখি হেমন্তে দক্ষিণে বা বসন্তে উত্তরে যাত্রাকালে বাংলাদেশে থামে এবং যাত্রাবিরতি অপেক্ষা কিছু বেশি সময় কাটায়। এমন প্রজাতির পাখিও রয়েছে যারা কেবল হেমন্তে বা বসন্তে তাদের গন্তব্যে পৌঁছার সময় বাংলাদেশের আকাশসীমা দিয়ে উড়ে যায়। কিছু পাখি পূর্ব থেকে পশ্চিমেও যায়। যারা সম্ভবত বাংলাদেশে আসে না। একই দেশের বা ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে গমনকে স্থানীয় পরিযায়ী বলে।

পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশে ৬ শতাধিক প্রজাতির পাখি রয়েছে। যার মধ্যে ২০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। জানা যায় যে, ইউরেশিয়ায় ৩০০ প্রজাতির বেশি প্রজননকারী পাখির এক তৃতীয়াংশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-যা আফ্রিকায় পরিযান করে। এসব পাখির এক তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে আসে। বাংলাদেশে সাইবেরিয়া থেকে বেশি সংখ্যক পাখিই আসে, অধিকাংশই আসে হিমালয় ও উত্তর এশিয়া থেকে। বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস ও বাংলাদেশ ১২ ও ১৩ই মে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস বা ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেনড বার্ড ডে হিসেবে পালন আমাদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ইউনিসেফ ও অন্যান্য সংস্থার উদ্যোগে ২০০৬ সাল থেকে প্রতিবছরই সারাবিশ্বে ৯ থেকে ১০ই মে পরিযায়ী পাখি দিবস পালন করে। ২০১৫ সালেও ৯-১০ই মে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস পালন করেছেন আমাদের পাখিবিদরা। ২০১৬ সালে ইউনেস্কোসহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা ১০ ও ১১ই মে দিন দুটিকে নির্ধারণ করে। কিন্তু আমাদের দেশে মূলত শীতকালে পরিযায়ী পাখি আসে। মে মাসে খুব একটা পাখি আসে না। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা পরিযায়ী পাখি ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্বের নানা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ২০১৬ সাল থেকে ১৮ই অক্টোবর দিনটি পালনের প্রস্তাব দেয়। এ প্রস্তাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও মণিপুরের পরিবেশবাদিরা এর সমর্থন করে।

ইউনিসেফ ও অন্যান্য সংস্থা মনে করে, ১০ই মে'র কাছাকাছি সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে ঘন উড়াল পথটি দিয়েই পরিযায়ী পাখিরা যাতায়াত করে। মে মাসের দ্বিতীয় শনিবার অর্থাৎ ১২-১৩ই মে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। ২০১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর ইউনিসেফ সিদ্ধান্ত নেয়, বছরের যে-কোনো সময়ে অর্থাৎ যে সময়ে যে এলাকায় পরিযায়ী পাখি আসে তখনই কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেতে পারে। ২০১৮ সালে দুই দিন প্রচারণা ধার্য করার বিষয়টি ছাড়াও বিশেষত্ব হচ্ছে, সারা বিশ্ব একযোগে উদ্‌যাপন করেছে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস বা ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেনড বার্ড ডে। ২০১৮ সালের প্রচারণায় বিশ্বায়নে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এই অর্জনের অন্যতম

অংশীদার বাংলাদেশ। গত এক যুগ ধরে পরিযায়ী পাখি গবেষণায় বাংলাদেশ অনেক সফল হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব কনজারভেশন ফর নেচার (আইইউসিএন) ও বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের শুমারির তথ্য মতে, গত পাঁচ বছর দেশে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা গড়ে ৮৫ হাজার বেড়েছে।

পরিযায়ী পাখি শুমারির তত্ত্বাবধায়ক ইনাম আল হক জানায়, টাঙ্গুয়ার হাওর, দোসার চর, হাকালুকি হাওর, বাইক্কার বিল ও সোনাদিয়া দ্বীপে জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত পাখি থাকে। আমাদের দেশে প্রায় ৭৩৬ প্রজাতির পাখি আনাগোনা করে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় ৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে।

আইইউসিএন ও বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের শুমারি অনুযায়ী, ২০১৫ সালে ১ লাখ ১২ হাজার পরিযায়ী পাখি পাওয়া গেছে। ২০১৪ সালে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৫ হাজার। ২০১৩ সালে প্রায় ৮০ হাজার। আইইউসিএন তথ্য মতে, টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর এলাকায় অতিথি পাখি আসা বেড়েছে। এক সময়ে পরিযায়ী পাখির অন্যতম আবাসস্থল বাইক্কার বিলে পাখি আসা কমে গেছে। ২০১০ সাল পর্যন্ত দেশে পরিযায়ী পাখির অন্যতম আবাসস্থল ছিল মৌলভীবাজারের বাইক্কার বিল। ২০১১ সালে এই বিলে মাছ ধরার নামে জীববৈচিত্র্য ও পাখির আবাসস্থল ধ্বংস করা হয়। ২০১৮ সালে বাইক্কার বিলে মাত্র ৪১৯টি পাখি দেখা গেছে। বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ড. আলী রেজা খানের মতে, টাঙ্গুয়ার হাওর পরিযায়ী পাখির জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্থান। এই জলাশয়টিকে জাতিসংঘের রামসার কর্তৃপক্ষ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ জলাভূমি হিসেবে ২০০০ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরপর থেকে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বেড়েছে। ২০০২-২০০৫ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লাখ।

পরিযায়ী পাখির অভয় আশ্রম বাংলাদেশ

বিশ্বের অসংখ্য দেশের মধ্যে পরিযায়ী পাখির জন্য সুন্দর অভয় আশ্রম হচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি নদনদী, হাওর-বাঁওড়, বিল-ঝিলে এসব পাখিদের বিচরণ লক্ষ করা যায়। সংশ্লিষ্টদের মত অনুযায়ী পাখির উপস্থিতি আমাদের দেশের পরিবেশ ও পর্যটন শিল্পকে প্রসারিত করছে। কেননা এরা স্বল্পকালের জন্য হলেও আমাদের প্রকৃতিতে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে সার্বিক পরিবেশকে নতুন রূপদান করে। পাখির সৌন্দর্য, কলতান, পাখা মেলে উড়ে বেড়ানো আদিকাল থেকেই মানুষকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে আসছে। পরিবেশ পর্যটনের জন্য বাংলাদেশের যে কয়টি স্থানে পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে সেসব স্থানে পর্যটকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল ও জলাভূমির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বাইক্কার বিল। এশিয়ার বৃহত্তম হাওর হাকালুকি পরিযায়ী পাখির এক নম্বর আবাসস্থল। এছাড়া টাঙ্গুয়া, হাকালুকি হাওর, বাইক্কা বিল, সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ, নীলফামারী জেলার নীলসাগর, ঢাকার মিরপুরের চিড়িয়াখানা ও জাতীয় উদ্যান, মিরপুর সিরামিক লেক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জলাশয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, পুটিয়ার পচামাড়িয়া, সুনামগঞ্জ জেলার টাঙ্গুয়ার হাওর, দিনাজপুরের রামসাগর, বরিশালের দুর্গাসাগর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asia Australasian Flayway Partnership)-এর সদস্য হয়েছে এবং ৫টি এলাকাকে Flayway sile ঘোষণা করেছে-এর মধ্যে রয়েছে টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া ও নিঝুম দ্বীপ। এ সকল এলাকায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়ার্ল্ড লাইফ প্রটেকশন প্রকল্পের আওতায় বনবিভাগ, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পাখিসমৃদ্ধ এলাকা ও পাখিপ্রেমী ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করার জন্য Bangabandhu Award for Wildlife Conservation প্রদান করা হচ্ছে। পাখিসমৃদ্ধ এলাকাকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় Ecological Critical Area ঘোষণা করেছে। এছাড়াও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের প্রয়োগ বেড়েছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে অপরাধ দমন ইউনিট গঠন করা হয়েছে এবং ২০১৭ সালে প্রায় ৭৫০০ পাখি উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে বলে বন অধিদপ্তরের সূত্র থেকে জানা যায়।

পাখি আমাদের জাতীয় সম্পদ বা ঐশ্বর্য। পরিযায়ী পাখি হচ্ছে জীববৈচিত্র্যের দূত। বিশুদ্ধ পরিবেশ বজায় রাখতে পরিযায়ী পাখিদের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন এবং এদের বিষ্ঠার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বাড়ে। তাই এদের সংরক্ষণ করা জরুরি।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশের নারীরা এখন সাফল্যের শিখরে

ফারিহা হোসেন

বর্তমানে বাংলাদেশে নারীদের জয়জয়কার অবস্থা বিরাজ করছে। এক সময় নারী শুধু গৃহের বৃত্তে বন্দি ছিলেন। এখন নারী গৃহ কোণ থেকে বেরিয়ে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতিসহ অন্যান্য বিস্তৃত কর্মে নিজেদের অবস্থান শক্ত করে নিচ্ছে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের নারী মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। এটা শুধু আমাদের মা-বোনদের জন্যই গর্বের, সম্মানের, মর্যাদার নয়, একই সাথে পুরো জাতির জন্য গর্বের এবং সম্মানের। বাংলাদেশের নারীরা এখন ঘরে-বাইরে, বিশ্বে নেতৃত্বে, কর্মে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে অবস্থান করছে। সদ্য চালু হওয়া রাইড শেয়ারিংসহ হেন কাজ নেই যেটাতে নারীর অবস্থান সগৌরবে রয়েছে।

শিক্ষকতা, নার্সিং, চিকিৎসা, বিজ্ঞানী, পাইলট, পুলিশ, নৌ-বিমান, সেনাবাহিনী, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা, ট্রেন চালনা, গবেষণায় সর্বত্রই দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছেন নারীরা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-নারী, স্পিকার-নারী, সংসদের উপনেতা-নারী, ইতঃপূর্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল-নারী, বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রী-নারী, আওয়ামী লীগ, বিএনপির প্রধানও-নারী। মোবাইল অ্যাপভিত্তিক পরিবহণ সেবা থেকে শুরু করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ড্রিমলাইনার 'আকাশবীণা' উড়িয়ে হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিচ্ছেন নারীরা। রাজনীতি, বিচারাঙ্গন, অর্থনীতি, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সরব উপস্থিতি তাদের। এভারেস্ট বিজয়ী হয়ে বাংলার নারী আরোহণ করেছেন সাফল্যের শিখরে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রকাশিত বৈশ্বিক লিঙ্গ বিভাজন সূচক ২০১৮ অনুযায়ী, বিশ্বে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে বাংলাদেশের অবস্থান। এ সূচকে বিশ্বের ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৪৮তম। ২০১৭ সালের তুলনায় ২৮ ধাপ অগ্রগতি। প্রতিবেদনে বলা হয়, এমনটা সম্ভব হয়েছে অর্থনৈতিক সুবিধা ও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায়। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও জঁ দ্রজ তাদের *ভারত: উন্নয়ন ও বঞ্চনা* (২০১৫ সালে প্রকাশিত) বইয়ে লিখেছেন, ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি অনেক বেশি। বাংলাদেশে ৫৭ শতাংশ নারী কর্মজীবী। ভারতে এ হার মাত্র ২৯ শতাংশ। তারা দেখিয়েছেন, নারীর সাক্ষরতা ও শিক্ষায়, মেডিক্যাল শিক্ষায় বাংলাদেশ এগিয়ে। স্বাধীনতার ৪৮ বছর পদার্পণে নারীর অগ্রগামিতা নিয়ে তৈরি হচ্ছে নানা সূচক। নারীর এ অগ্রযাত্রার বিষয়ে দেশের উচ্চ আদালতে প্রথম নারী বিচারক নাজমুন আরা সুলতানার অভিমত, 'প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা দক্ষতার পরিচয় দিয়ে উপযুক্ত অবস্থান তৈরি করে নিচ্ছে। নারীরা আর পিছিয়ে পড়াদের দলে নেই। নিম্ন আদালতের বিচারক পদে এখন নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উচ্চ আদালতে সে সংখ্যা খুবই কম। তাই প্রত্যাশা, যোগ্যতার বিচারে আরো বেশি সংখ্যক নারীকে উচ্চ আদালতের বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া দরকার'।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, ২০১৬ সালে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭২তম। ২০০৭ সাল থেকে টানা নয় বছর লিঙ্গবৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, বর্তমানে প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে ৭ দশমিক ৬ শতাংশ নারী আছেন। সচিব পদে আছেন ৭ জন। তবে উপসচিব থেকে সচিব পর্যায়ে নারীর সংখ্যা ১ শতাংশ বা তারও কম। দেশে সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০ লাখ ৯৬ হাজার ৩৩৪টি। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮৩ হাজার ১৩৩। ১৯৭৪ সালে কর্মক্ষেত্রে নারী ছিল ৪ শতাংশ, এখন ৩৩ শতাংশ।

সাংবাদিকতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে নারীরা এগিয়ে আসছেন এ পেশায়। এর ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সাংবাদিকতার মতো ঝুঁকিপূর্ণ, দায়িত্বশীল পেশায়ও নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এ পেশায় আসতে নারীকে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে হয়েছে। ১০ বছর আগের এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ঢাকা শহরে কর্মরত দেড় হাজার সাংবাদিকের মধ্যে মাত্র ৬০ জন ছিলেন নারী। অর্থাৎ মোট সাংবাদিকের ৪ শতাংশ। তবে টেলিভিশন চ্যানেল ও দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন বৃদ্ধির কারণে এ সংখ্যা বর্তমানে বেড়েছে, এখন প্রায় দুইশতাধিক নারী কর্মরত আছেন এ পেশায়। জাতীয় প্রেস ক্লাবের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত প্রথম নারী সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিনের অভিমত, 'গণমাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ আশানুরূপভাবে বাড়ছে। নারীরা কঠোর পরিশ্রম, দক্ষতা, যোগ্যতা দিয়ে এ পেশায় নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর সংখ্যা এখনো হাতে গোনা। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উচ্চ পর্যায়ে নারীদের পদোন্নতি বাধাগ্রস্ত করা হয়'।

চিকিৎসা, শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা পুরুষকে ছাড়িয়ে গেছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চলতি শিক্ষাবর্ষে ২২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। তার মধ্যে ১৩৬ জন ছাত্রী, ছাত্র মাত্র ৮৪ জন। আবার ১০ বছরে পুরুষের তুলনায় এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জনকারী নারীর সংখ্যাও প্রায় ৩ হাজার বেশি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, এ বছর মেডিক্যাল কলেজগুলোয় ১০ হাজার ২২৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। তার প্রায় ৬০ শতাংশ ছাত্রী। জাতিসংঘের শান্তি মিশনের সদস্য হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘাতপূর্ণ অবস্থা থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সেনা, নৌ-বিমান বাহিনীর নারী কর্মকর্তারা অত্যন্ত দক্ষতা, যোগ্যতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি মিশনে অংশ নিয়ে আমাদের নারী নিখুঁত ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন এবং এজন্য তারা প্রশংসিতও হচ্ছেন। আমাদের প্রত্যাশা নারীরা দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, অগ্রযাত্রা, কল্যাণে ঘরে বাইরে, দেশে-বিদেশে আরো বেশি সক্রিয় হবেন ভবিষ্যতে। তবেই দেশ, জাতির, পরিবারের, সমাজের মঙ্গল হবে।

লেখক: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস প্রাসঙ্গিকতা ও প্রত্যাশা

হোসেন জাহিদ

আমরা যেভাবেই বলি বা যেভাবেই প্রকাশ করি না কেন পরিবার হলো একটি রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কারণ বৃহত্তর পরিসরে পরিবারগুলোই একত্রিত হয়ে সমাজ গঠন করে। তাই সমাজ তৈরিতে পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য। মানুষ পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মূলত সমাজের মৌলিক উপাদান হচ্ছে পরিবার। বাংলাদেশ তথা পৃথিবীব্যাপী পরিবার হলো মৌলিক সামাজিক ভিত্তি। যেদিন থেকে সভ্যতার শুরু হয়েছিল সেদিন থেকেই মানুষ সামাজিক জীব হয়ে পরিবারভিত্তিক জীবনযাপন শুরু করেছে। সেই হিসেবে পরিবার হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। সভ্যতার গোড়াপত্তন এবং বিকাশ ঘটেছে পরিবারের উপর ভিত্তি করে। মানুষের সর্বপ্রথম বিদ্যাপীঠও বলা হয় পরিবারকে। জীবন মূলত গড়ে ওঠে এখান থেকেই। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও দৃঢ় বন্ধনের মাধ্যমে পরিবারে বেড়ে ওঠা একজন মানুষ সমাজের সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করে থাকে। তাই মানুষের জীবনে পরিবারের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিবার ও পরিবার দিবস: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৯৩ সালে গৃহীত এক প্রস্তাব অনুযায়ী ১৫ই মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৪ সালকে আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষও ঘোষণা করেছিল জাতিসংঘ এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সাল থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রতিবছর এ দিনটি আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। পারিবারিক বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মাঝে বন্ধন দৃঢ়করণ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূলত এ দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সবাইকে নিয়েই গঠন হয় এক একটি পরিবার। তবে সমাজভেদে, সংস্কৃতিভেদে পরিবারের গঠন, কাঠামো, কার্যক্রম ও সার্বিক ভূমিকা ভিন্ন হয়ে থাকে। সময়ের সাথে সভ্যতার বিকাশের সাথে আর টেকনোলজির উন্নতির সাথে সাথে সমাজে ও রাষ্ট্রে পরিবারের ভূমিকা যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে, সাথে সাথে পারিবারিক কাঠামো আর মূল্যবোধেও আসছে ভিন্নতা। তবে পরিবারের মৌলিক কাজ অনেক। একদিকে জৈবিক অপরদিকে মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাদান ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব শিশুর সামাজিকীকরণ এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ। যে শিশুটি ভবিষ্যতের নাগরিক তার মনোজগত প্রস্তুত হয় পরিবারে। পরিবারের প্রথা ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে তার জীবনভঙ্গি গড়ে ওঠে।

পরিবারের গুরুত্ব: মানুষের জীবনে পরিবারের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবারভিত্তিক অনেক মৌলিক কাজ রয়েছে। যেমন– ১. জৈবিক, ২. মনস্তাত্ত্বিক, ৩. অর্থনৈতিক, ৪. শিক্ষাদান, ৫. শিশুর সামাজিকীকরণ, ৬. সংস্কৃতির সংরক্ষণ, ৭. মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ, ৮. সমমর্যাদার নিশ্চয়তা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমঅধিকার এবং ৯. সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও জীবন মান উন্নয়ন।

আজকের শিশু আগামীর দক্ষ নাগরিক। এই শিশুকে উপযোগী করে গড়ে তোলে পরিবার। শিশুর মনোজগত প্রস্তুত হয় পরিবারে। পরিবারের ধরন, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি এসবের ওপর ভিত্তি করে শিশুর জীবন-আচরণ গড়ে ওঠে। তার চারিত্রিক সদ্ভাব গড়ে তোলা, সাংসারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, মিথ্যে না বলা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে ফেরা, নিজের কাজ নিজে সম্পন্ন করা, মিথ্যেকে ঘৃণা করা এবং সত্যকে বিশ্বাস ও দৃঢ় মনে ধারণ করা ইত্যাদি সবকিছুই শিশু পরিবার থেকে শিক্ষা লাভ করে।

বাস্তবতা: পরিবার আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেমন এটা অস্বীকার করার জো নেই যে, আমাদের দেশেও পরিবারের কাঠামো আগের মতো নেই। সময়, জীবন-জীবিকা, মানসিকতা ও মূল্যবোধের দ্বান্দ্বিক কারণে আমাদের পরিবারগুলো ভেঙে একক পরিবারে রূপ নিচ্ছে। মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সবাই মিলে যে সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ ছিল তা হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা, স্বার্থের দোলাচলে আমরা অনেকেই ভুলে যাই পরিবারের আপনজনদের কথা। এমনকি বাবা-মায়ের খোঁজও নেওয়া হয় না। তাই আমাদের সমাজে দিন দিন বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এমনকি ছোটো পরিবারেও সহনশীলতা আর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ না থাকায় অশান্তি বিরাজ করতে দেখা যায়। এর প্রভাব সরাসরি সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ওপর পড়ছে, পাশাপাশি সেই পরিবারের শিশুরা বেড়ে উঠছে বিরূপ পরিবেশে। সুস্থ মানবিক ও মানসিক বোধ গঠন হচ্ছে বাধাগ্রস্ত।

পারিবারিক অশান্তির কারণে ঘটছে নানা ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। পরিবারে সৌহার্দ্যের অভাবে সন্তানের হাতে বাবা-মায়ের নাজেহাল অবস্থা, ভাই-ভাই ঝগড়াঝাটি, মারামারি– মৃত্যু পর্যন্ত গড়াচ্ছে। বৃদ্ধ বাবা-মাকে অবহেলার মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে আশঙ্কাজনকভাবে। পারিবারিক অশান্তির জন্য মানুষের মানসিক ও মানবিক বোধের অবক্ষয় হচ্ছে।

সুন্দর পরিবারের জন্য করণীয়: পারিবারিক সুখ-শান্তি যাতে বিনষ্ট হতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে সকলকে। ঘর বা পরিবার এক পবিত্র আশ্রয়। পরিবার হবে আশ্রয়ের সর্বোত্তম জায়গা সুইট হোম। পরিবারের মধ্যে ভালোবাসায় ভরপুর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও সুন্দর পরিবেশ থাকতে হবে। আগে নিজের পরিবারকে তারপর দেশকে ভালোবাসতে হবে। কারণ নিজের পরিবারকে ভালোবাসতে না পারলে নিজের দেশকে ভালোবাসা সম্ভব নয়। পরিবার শক্তিশালী হলে সমাজ এগিয়ে যাবে আর দেশ হবে শক্তিশালী।

পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। দুজনের ভূমিকা ও অধিকার হতে হবে সমান ও সম্প্রীতির। অন্যসব সদস্যরও থাকতে হবে সমান অধিকার। মর্যাদা হবে যথাযোগ্য। সবার আবেগের মূল্যায়ন করতে হবে যৌক্তিকভাবে সময়ের নিরিখে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ পরিবারের কাঠামোকে করতে পারে মজবুত।

পরিবারগুলো মানুষের স্নেহ-ভালোবাসার চাহিদাসহ অন্য অনেক চাহিদাও মেটায়। তাই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সমাজের সার্বিক কল্যাণে ভালোবাসা ও স্নেহ, শ্রদ্ধা ও সমঝোতার মাধ্যমে পরিবারকে একটি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। সবাই মিলে পারিবারিক ভাঙন রোধ করতে হবে। মূল্যবোধের আলোকে একটি সুদৃঢ় পরিবার গড়ে তুলতে হবে। পরিবার দিবসে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

লেখক: প্রাবন্ধিক

ই-পার্লামেন্টের অগ্রযাত্রা

মো. শাহেদুল ইসলাম

বিশ্বের বহুদেশের ন্যায় বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি সর্বস্তরের জনসেবা প্রতিষ্ঠান ও অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ই-প্রযুক্তির ছোঁয়ায় গতিশীল হয়ে উঠছে সকল কর্মকাণ্ড। আর তারই স্পর্শে মুখরিত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ। যেখানে দেশের সর্বস্তরের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার হিসাবনিকাশ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। সংসদ সচিবালয়ের বিভিন্ন শাখা-অধিশাখা, দপ্তরসহ সকল ভিআইপি'র কার্যালয়গুলোতে ইন্টারনেট কানেকশনসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার, সার্ভার, প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি প্রতিদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া সংসদ সচিবালয়ের কম্পিউটারসমূহ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সকল ধরনের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কর্মকাণ্ড ই-সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট শাখা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ওয়েবসাইট চালু করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় সংসদে কার্যবিধি, অন্যান্য সংসদের তথ্যাদি, সংসদের কার্যক্রম, লেজিসলেইটিভ তথ্য, সংসদ সদস্যগণের তালিকা, কমিটি সভার নোটিশসহ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সালে অষ্টম জাতীয় সংসদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ২৪ জন সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণে ICT Caucus গঠিত হয়েছিল উন্নয়নের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করার অভিপ্রায়ে। উক্ত ককাসের মাধ্যমে Governance, Health, Education, Legal Support and Human Rights Disaster Management, Environment, Gender Mainstreaming, Youth Empowerment, Social Participation-এর ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত উন্নয়ন চিহ্নিতকরণে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। নবম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৫০ জনসহ মোট ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের ভেতর ১৫০ জনের নিজস্ব ই- মেইল আইডি আছে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ওয়েবসাইট আইডি রয়েছে। পার্লামেন্ট হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ। গণতন্ত্রচর্চা এবং গণতন্ত্রের মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে পার্লামেন্ট প্রধানত তিনটি ভূমিকা পালন করে। যেমন:

আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি।

জাতীয় সংসদে ই-পার্লামেন্টের যথাযথ ব্যবহার ও কার্যকারিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য ঘোষিত 'ভিশন-২০২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ' নির্মাণে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও অবাধ ব্যবহারের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে ছিল–

জাতীয় সংসদের অধিবেশনে কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রসারণের জন্য 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন; চ্যানেল চালু, সব সংসদ সদস্যদের ওয়েব অ্যাড্রেস থেকে ই-মেইল আইডি প্রদান করা, প্রতিটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির কার্যালয়ের জন্য জাতীয় সংসদের ওয়েব অ্যাড্রেস থেকে ই-মেইল আইডি প্রদান করা, সংসদ অধিবেশন চলাকালীন দিনের কর্মসূচি ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ, স্থায়ী কমিটির সভাসমূহের তারিখ, সময়, সভার স্থান ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ, সংসদ সদস্যদেরকে সংক্রান্ত কার্যক্রমের ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও কম্পিউটারভিত্তিক নথিসংরক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থা তৈরি করা।

ই-পার্লামেন্ট হচ্ছে পার্লামেন্টারি প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্মকাণ্ড এবং পরিচালনার বিষয়গুলো জোরদার করা এবং সংসদের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের উন্নতির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহার। তাছাড়া গণতন্ত্র এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে ই-পার্লামেন্ট কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে অবলীলায়। ই-পার্লামেন্ট, ই-গভর্নমেন্ট এবং ই-ডেমোক্র্যাসি উভয় বিষয়ের সঙ্গেই দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংসদীয় ক্রিয়াকলাপের উন্নতি করা সংসদের কাজকর্মের কার্যকারিতা এবং প্রভাবের উন্নতির মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরো বেগবান করতে ই-পার্লামেন্ট যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। তারই আলোকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ই-পার্লামেন্ট বাস্তবায়নে উল্লেখিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে গণমাধ্যমকর্মী এবং রাজনীতিবিদদের কার্যকর তথ্য পরিসেবা প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং আইনি ব্যবস্থাকে আইনি প্রণয়নের প্রক্রিয়া অনুসরণ করার সুযোগ সৃষ্টিসহ জনসাধারণের সামনে প্রশাসনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি সম্ভব হবে যা সংশ্লিষ্ট সকলে মনে করেন। উল্লেখিত কার্যকর পদক্ষেপগুলো হচ্ছে– প্রতিটি স্থায়ী কমিটির জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা, পৃথকভাবে সংসদ সদস্যদের জন্য একটি Interactive ওয়েবসাইট কার্যকর করা, জাতীয় সংসদের অধিবেশনের কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচারের জন্য আলাদাভাবে রেডিও চ্যানেল চালু করা, জাতীয় সংসদের কার্যকরী ওয়েবসাইটকে অত্যাধুনিক অর্থাৎ অডিও ভিজ্যুয়াল সন্নিবেশ করা, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক জাতীয় সংসদের ই-সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট শাখাকে গতিশীল করা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জনসাধারণকে সেই ধারণা প্রদান করে যাতে করে তারা জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করা এবং জড়িত থাকার মাধ্যমে আরো সক্রিয়ভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ইন্টারনেটের আদান-প্রদানের ধরন, প্রতিনিধি এবং নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক সহজসাধ্য করে তুলতে সাহায্য করতে পারে। বর্তমানে সংসদ সদস্যগণ জনগণের সাথে যোগাযোগের যেসব ক্ষেত্রে ই-সেবা ব্যবহার করে থাকেন সেগুলোর মধ্যে–

ই-মেইলের মাধ্যমে পার্লামেন্ট এবং পৃথকভাবে সংসদ সদস্যদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। মোবাইল ফোনও যোগাযোগের প্রধান ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম হিসেবে প্রধান্য পাচ্ছে, অনলাইন ডিসকাশন জনগণের সাথে মতবিনিময়ের জন্য অনলাইন ডিসকাশন এলাকার জনগণের সাথে স্থানীয় অঞ্চলের সমস্যা, উন্নয়ন নানান কর্মকাণ্ডের বিষয়ে মতবিনিময় করতে পারছেন, ওয়েব সাইট জনগণকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে একমুখী টুল হিসেবে ওয়েবসাইটের বহুল প্রচলন রয়েছে। এর মাধ্যমে পার্লামেন্ট এবং জনগণের মধ্যে প্রচুর নিবিড়তার বৃদ্ধি ঘটছে, ব্রডকাস্টিং বা ওয়েব কাস্ট্রিং ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম টেলিভিশন এবং রেডিও-এর মাধ্যমে সংসদ সদস্যরা এবং রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতাদর্শ ও অন্যান্য বিষয়গুলো সাধারণ জনগণের কাছে উপস্থাপন করতে পারেন।

লেখক: অতিথি প্রযোজক, বার্তা বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

নিবন্ধ

জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর অবদান

সানজিদা আহমেদ

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ১৯৮৮ সালে UNIMO (United Nations Iran-Iraq Military Observers Group)-এ ১৫ জন সেনাসদস্য প্রেরণের মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সদস্য প্রেরণ আরম্ভ হয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বর্তমানে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী এবং বাংলাদেশ পুলিশবাহিনী সর্বমোট ৭০-৮০ জন শান্তিরক্ষী মোতায়েন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ৬২ জন নারী শান্তিরক্ষী কর্মকর্তা বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েন রয়েছে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ১,৫৬,১৮৪ জন সদস্য শান্তিরক্ষা মিশন সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে ৩০৭ জন নারী কর্মকর্তা এবং ১৮০৯৯ জন পুলিশ বাহিনীর সদস্য। প্রতিবছর ২৯শে মে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবসটি পালিত হচ্ছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশের সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা সেনাবাহিনী ৫৪৫৬ জন, নৌবাহিনী ৩৪০ জন, বিমানবাহিনী ৫০১ জন ও পুলিশবাহিনী ৭৮৩ জন। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যগণ দেশের ভাব-মর্যাদা উজ্জ্বল করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন তা নিম্নরূপ:

বাংলাদেশের সেনাবাহিনী: বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেছে। উত্তর মালির তাবান কোর্টে জাতিগত সংঘর্ষের যে সূত্রপাত হয়েছিল তা দমন এবং সমাধান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের সেনাসদস্য কর্তৃক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এলাকায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করে– ক) গরিব ও দুস্থ জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ও ঔষধ সরবরাহ, খ) জাতিগঠন (Nation Building)-এর অংশ হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ) শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে সহায়তা করা।

পুলিশবাহিনী: ১৯৮৯ সাল থেকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা অংশ নেয়। নির্বাহী ও পর্যবেক্ষণ মিশনে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এদেশের পুলিশ সদস্যরা বিভিন্ন জটিল দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন। নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি টেকসই পুলিশ ব্যবস্থা উন্নয়ন মানুষের জন্য ঝুঁকি প্রশমন ছিল তাদের অন্যতম কাজ। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে এ পর্যন্ত মোট ৭ হাজার ৫২২ পুলিশ সদস্য অংশ নিয়েছিল। বর্তমানে ৯টি মিশনে ২ হাজার ৫৩ পুলিশ সদস্য মোতায়েন আছেন।

বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশিদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। সেই সশস্ত্র বাহিনীর পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি পিছিয়ে নেই নারী সদস্যরাও। বাংলাদেশ পুলিশের ১২৫ জন নারী সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর কঙ্গো মিশনে যোগ দিয়েছেন। এই সদস্যের দলটির কমাণ্ডের দায়িত্ব পালন করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মতিয়া হোসনা। বাংলাদেশ পুলিশের অপর এক নারী এফপিইড হাইতিতে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে কঙ্গো, দক্ষিণ সুদান, দারফুর, আইভরি কোস্ট, হাইতি, মালি, লাইবেরিয়া এবং সোমালিয়াসহ বিভিন্ন শান্তি মিশনে বাংলাদেশের পুলিশের ১৩৬৯ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।

শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে– 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'। বিশ্বের বিরোধপূর্ণ স্থানে জাতিসংঘের ডাকে শান্তি স্থাপন করা দেশের সশস্ত্রবাহিনীর জরুরি দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা অসীম সাহসিকতায় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। শান্তিরক্ষার পাশাপাশি রাস্তাঘাট নির্মাণ, চিকিৎসা সেবাসহ সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সুনাম অর্জন করেছেন তারা।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণে সারাবিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ গত ক'বছর ধরেই শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ ৯টি দেশের শান্তি স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা জীবনবাজি রেখে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান আইভরি কোস্ট, পশ্চিম সাহারা, কঙ্গো ও লাইবেরিয়ায় সশস্ত্রবাহিনীর ২৩ জন নারী সদস্য কাজ করেছেন। বাংলাদেশ পুলিশের ২ হাজার ৫৩ জন পুলিশ সদস্য এখন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করছেন। তাই দিন দিন জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের সুনাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বেত: অর্থকরী ও পরিবেশ সুরক্ষায় প্রাকৃতিক সম্পদ

এ.টি.এম নুরুল ইসলাম

বেত এক প্রকার কাঁটাযুক্ত আরোহী উদ্ভিদ। এর দেহে প্রচুর কাঁটা থাকে। বেত গাছ কাণ্ড, পাতা, পত্রক, ফুল, ফল ইত্যাদি অঙ্গের সমষ্টি। লাঠির মতো লম্বা অঙ্গই কাণ্ড। আসবাবপত্র ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী তৈরিতে এটা ব্যবহার হয়। কাণ্ডের মসৃণ দেহে কিছু অন্তর অন্তর গিট থাকে যাকে পর্ব বা নোড (Node) বলে। দুটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশকে পর্বমধ্য বা ইন্টারনোড (Internode) বলে। কাণ্ডের উভয় পাশে পাতা উৎপন্ন হয়। পাতা পক্ষল বা পিনেট (Pinate) যৌগিক। বৃন্ত বা বোঁটা, মধ্য দণ্ড বা রেকিস (Rachis) ও পত্রক এই তিনটি মূল অংশ নিয়ে পাতা গঠিত। অনেক সময় পাতার গোড়া অথবা অগ্রভাগে কাঁটাতারের মতো লম্বা শুঁড় দেখা যায়। গোড়া থেকে উৎপন্ন শুঁড়কে ফ্লাজিলাম (Flagellum) ও পাতার শীর্ষভাগ থেকে উৎপন্ন শুঁড়কে সিরোজ (Cirrose) বলে। ফলের ওপরে আঁইশের মতো আবরণ থাকে। এটাই ফলের বহিরাবরণ বা ইপিকার্প (Epicarp)। বহিরাবরণের নিচে নরম মাংসল অংশ সারকোটেসটা, যা ক্ষেত্রবিশেষে খাওয়ার যোগ্য। শক্ত বীজ সারকোটেসটা দ্বারা আবৃত থাকে। প্রজাতি ভেদে একটি বেত লম্বায় ৩০ মি. থেকে ৯০ মি. (৯৮.৪'-২৯৫.৩') পর্যন্ত হতে পারে। বেত পামি (Palmae) গোত্রের আওয়াধীন লেপিডোকেরিওডি (Lapidocaryoideae) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই সম্প্রদায় ১১টি গণের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি গণের মধ্যে এক বা একাধিক প্রজাতি বিদ্যমান। সবচেয়ে বড়ো হচ্ছে কেলামাস (Calamus), যার মধ্যে প্রায় ৩৭০টি প্রজাতি আছে। গণের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ডেমোনোরপস (Daemonorops), যার মধ্যে ১১৫টি প্রজাতি আছে।

বেত একটি মূল্যবান বনজ সম্পদ, যা ঘরের আসবাবপত্র তৈরি ও কুটির শিল্পের জন্য মূল্যবান কাঁচামাল। কুটির শিল্পে উৎপাদিত বেতের বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা দেশ-বিদেশে প্রচুর। এক সময় এই দেশে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর বেতঝাড় ছিল। বর্তমানে বেত ঝাড়ের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। যথেচ্ছ ব্যবহার এবং পরিকল্পিত চাষাবাদের অভাবই বেত সম্পদ ধ্বংসের অন্যতম কারণ। অথচ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজাতির বেতের চাষ করা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। সামান্য ভেজা জায়গায় এ ফসলটি উৎপাদন করা যায়। বেতের ফসলি অংশ হলো বেতের কাণ্ড। গ্রাম অঞ্চলে বাড়ির প্রান্ত সীমানায়, ঝোপ-জঙ্গল ইত্যাদি জায়গায় বেতের ঝাড় পাওয়া যায়। বন অঞ্চলে ছড়ার পাড়ে ভেজা জায়গায় বেত জন্মে। ইতঃপূর্বে এশিয়া মহাদেশীয় বেত ও মালয়েশিয়ার বট্রনসহ ৫৫০টি প্রজাতিরও বেশি বেত প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। বাঁশের মতো বেতের রাজত্বও এশিয়া মহাদেশে। প্রায় সমগ্র এশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃষ্টিবহুল বনাঞ্চলে বেত একটি অন্যতম গৌণ বনজ সম্পদ। ভারত-বাংলাদেশ এবং চীনের দক্ষিণাঞ্চলে বেত পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেতের প্রাপ্যতা বেশি। বাংলাদেশে ১২টি বিভিন্ন প্রজাতির বেত পাওয়া যায়। এগুলোর স্থানীয় নাম, বৈজ্ঞানিক নাম ও প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হলো:

ক্র. নং	স্থানীয় নাম (বৈজ্ঞানিক নাম)	প্রাপ্তিস্থান
০১.	গোল্লাবেত, গোলকবেত (Daemonorops Jenkinsiana (Griff. Mart.)	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট
০২.	কদমবেত, সীতাবেত Calamus eretus Roxb.)	চট্টগ্রাম ও সিলেট
০৩.	বড়োবেত (C. viminalis Willd)	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা, ময়মনসিংহ
০৪.	জালিবেত, সুন্দিবেত (C. guruba Buch.-Ham.)	চট্টগ্রাম, সিলেট, কক্সবাজার
০৫.	বুদুমবেত, কেরাকবেত (C. Latifolius Roxb.)	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার
০৬.	বান্দরীবেত, পাতিবেত (C. tenuis Roxb.)	চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, যশোর
০৭.	মাপুরিবেত (C. gracilis Roxb.)	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার
০৮.	হুদুমবেত (C. flagellum Griff.)	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার
০৯.	শাঁচিবেত (C. rotung L.)	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার
১০.	স্থানীয় নাম পাওয়া যায়নি (C. floribundus Griff.)	--------
১১.	উদমবেত (C. longisetus Griff.)	কক্সবাজার
১২.	স্থানীয় নাম পাওয়া যায়নি (C. quinquenervius Griff.)	--------

বেত বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী প্রাকৃতিক গৌণ বনজ কৃষি সম্পদ। দেশের কুটির শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল বেত। কাঠ ও বাঁশের চেয়ে বেতের তৈরি দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও মূল্য উভয়ই বেশি। বেতের ব্যবহার আভিজাত্য বহন করে। নন্দন শিল্প প্রেমিকদের কাছে বেতজাত সামগ্রী অত্যন্ত সমাদৃত। অন্যান্য ফলজ ও বনজ গাছের সাথে মিশ্র বেত চাষ করা যায়। গাছ বেতের আরোহী হিসেবে কাজ করে। আরোহী ছাড়া বেতের বর্ধন ভালো হয় না।

নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করার জন্য বেতের উপস্থিতি দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে। অন্যান্য ফসলের মতো বেত চাষে তেমন যত্নের প্রয়োজন হয় না এবং খরচও কম। বেতের গায়ে কাঁটা থাকার কারণে বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও তেমন নেই। দেশ-বিদেশে বেতের তৈরি সামগ্রীর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেতের কাণ্ড পরিপক্ক হতে ৬-৮ বছর সময় লাগে। বেত একবীজপত্র উদ্ভিদ এবং কাঁটাযুক্ত আরোহী। প্রজাতিভেদে বেতের কাণ্ড পাট গাছের মতো সরু থেকে বাঁশের মতো মোটা হয়ে থাকে। বেতের কাণ্ড সব সময়ই কাঁটাযুক্ত পাতা আবরণীতে ঢাকা থাকে। প্রতিবছর ফুল, ফল ধরে বলে এর শনাক্তকরণ ও বংশ বিস্তার বাঁশের চেয়ে অনেকাংশে সহজতর হয়। প্রজাতিভেদে দু'ধরনের কাণ্ডযুক্ত বেত পাওয়া যায়। একটি হলো গুচ্ছ কাণ্ডযুক্ত এবং অন্যটি হলো একক কাণ্ডযুক্ত। গুচ্ছ কাণ্ডযুক্ত বেত বাঁশের মতো একটি মোথা থেকে অনেকগুলো কাণ্ড উৎপন্ন করে। বাংলাদেশে বেতের প্রজাতিগুলো প্রায় সবই গুচ্ছ কাণ্ডযুক্ত শ্রেণির। বেতের মাটি সংলগ্ন মোথা কাণ্ড থেকে শাখা উদ্ভিদ হয়ে বেতের ঝাড় সৃষ্টি হয়। প্রজাতিভেদে বেতের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য ৩০-৭০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। যত বেশি দিন না কেটে রেখে দেওয়া যায় ততই বেত লম্বায় বাড়তে থাকে। কদম বেত সবচেয়ে মোটা ও শক্ত বলে আরোহীর প্রয়োজন হয় না। বেতের স্ত্রী ফুল থেকে থোকায় থোকায় ফুল ধরে। বেতঝাড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ফলগুচ্ছকে বেথুন বলে। ফলের মাংসল অংশ খাওয়া হয়। এতে টক, মিষ্টি ও মৃদু বিরেচক স্বাদ আছে। বীজ থেকে সহজে চারা উৎপন্ন করা যায়। সরু বেতগুলোর দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হয় যা প্রায় ২০০ হাত পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

প্রজাতিভেদে বেতের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। দৈর্ঘ্যেরভিত্তিতে বাংলাদেশের বেতকে খাঁটো কাণ্ডযুক্ত বেত এবং দীর্ঘ কাণ্ডযুক্ত বেত এ দুভাগে ভাগ করা যায়। খাটো কাণ্ডযুক্ত বেতের শ্রেণিতে একমাত্র কদম বেত বা সীতাবেত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ বেতের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ১৭ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। অন্যান্য বেতগুলো সর্বই দীর্ঘ কাণ্ড শ্রেণিভুক্ত। তন্মধ্যে সবচেয়ে খাটো বেতের দৈর্ঘ্যই প্রায় ১৬০-১৭০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। এ পর্যন্ত ৬০০ প্রজাতির বেত শনাক্ত করা হয়েছে। যেসব বিদ্যমান বেত প্রজাতি পার্বত্য ও অন্যান্য অঞ্চলে রয়েছে সেগুলোকে ব্যাপকভাবে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

বীজ থেকে বংশ বিস্তার ও অঙ্গজ বংশ বিস্তারের মাধ্যমে বেত চাষ করা হয়। বেতের বীজ থেকে বংশ বিস্তারই সহজ ও সুবিধাজনক। ঝাড় থেকে পাকা ফল সংগ্রহের পর ১০-১৫ দিনের মধ্যেই সংগৃহীত বীজগুলো বীজতলাতে বপন করতে হয়। বীজ বপনের পূর্বে ছাই অথবা অম্ল দ্রবণে ঘণ্টাখানেক ভিজিয়ে রেখে পরে বীজগুলো ধুয়ে নিয়ে বীজতলাতে বপন করলে দ্রুত অঙ্কুরোদগম হয়। বীজতলায় মাটির মিশ্রণ দো-আঁশ মাটি ও গোবর ৩:১ হাওয়া আবশ্যক। প্রজাতিভেদে বীজ থেকে চারা গজানোর সময় ভিন্ন হয়ে থাকে এবং তা ১–৬ মাসের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। বীজতলাতে চারা গজানোর ১–৪ সপ্তাহ পর্যন্ত রেখে দেওয়া উত্তম। চারা প্রায় ১ বছর ধরে পলি ব্যাগে রাখার পর নির্ধারিত জায়গায় রোপণ করার জন্য উপযুক্ত হয়। পতিত জমিতে সাধারণত বেত চাষ করা হয়। জমি তৈরির ১ সপ্তাহের মধ্যে রোপণ করা উপযুক্ত সময়। বেতের বীজ থেকে চারা উৎপাদন ব্যতীত অন্যভাবে বংশ বিস্তার হলো বেতের ঝাড়ের মাটির নিচে অবস্থিত বেতের মোথা। মোথা রোপণ করে অন্যত্র বেতের ঝাড় সৃষ্টি করাকে অঙ্গজ বংশ বিস্তার বলা হয়। অপেক্ষাকৃত পুরোনো ঝাড় থেকে মোথা সংগ্রহ করা উত্তম। বীজ থেকে চারা তৈরি করে ঝাড় সৃষ্টি করা সুবিধাজনক। প্রজাতিভেদে ৭-১০ ফুট দূরত্বে চারা রোপণ করা ভালো। বেত চাষের ক্ষেত্রে আরোহী গাছ-শিমুল, মান্দার, কড়ই গাছ ভালো। প্রাকৃতিক উপায়ে নিরাপত্তা প্রাচীর তৈরিতে বেত অদ্বিতীয় এবং বেত ভূমিক্ষয় রোধ করে। বেত ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ। বেতের কচি পাতা, কচি কাণ্ড ও ফল বিশেষ এক ধরনের ভেষজে সমৃদ্ধ। পল্লি অঞ্চলে বেতের আগার অংশ কৃমি প্রতিরোধে শিশুদের খাওয়ানো হয়। প্রজাতিভেদে রোপণের ৭-৮ বছরের মাথায় বেত কাটার উপযুক্ত সময়। ঝাড়ের সমস্ত বেত এক সাথে আহরণ করা অনুচিত। ঝাড় থেকে সবচেয়ে পরিপক্ক ও সবচেয়ে লম্বা বেত কাণ্ড আহরণ করে ছোটো কাণ্ডগুলো বেত ঝাড়ে রেখে দিতে হয়। বেতের পাতা যখন হলুদ রং ধারণ করে এবং কাঁটার রং যখন কালো হয় তখনই ধরে নিতে হবে কাণ্ডটি পরিপক্ক হয়েছে। বেতের ফুল ফুটলে অনেকটা পরিপক্ক হয়েছে বলা যায়। ধারালো দা ব্যবহার করে বেত আহরণ করতে হয় এবং গোড়া মসৃণ করে কাটতে হয়। ঝাড় থেকে একসাথে বেশি সংখ্যক বেত কাটা এবং বেশি সংখ্যক মোথা উত্তোলন করা অনুচিত।

বেত একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ আকর্ষণীয় আসবাবপত্র ও কুটির শিল্পের অনন্য কাঁচামাল হলো বেতের কাণ্ড। বেতজাত শিল্পকে ৪ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা ১. হালকা নির্মাণ শিল্প; যেসব বেতজাত শিল্পে অপেক্ষাকৃত মোটা বেত ব্যবহার হয় প্রধানত কমবেশি ভার বহনের কাজে লাগে সেগুলোকে হালকা নির্মাণ শিল্প বলা হয়। হালকা নির্মাণ শিল্পের উদাহরণ হলো আসবাবপত্র যেমন– সোফা, চেয়ার, সেলফ, ট্রলি, খাট, টেবিল, পার্টিশন, লাঠি, ছাতার বাট ইত্যাদি, ২. যেসব বেত অপেক্ষাকৃত সরু, নমনীয়, সেসব বেতের কাণ্ড চেরাই করলে পৃষ্ঠদেশ থেকে এক ধরনের শক্ত কিন্তু নমনীয় ফালি পাওয়া যায়। বেতের এরূপ চেরাইকৃত ফালিকে বেতি বলে, ৩. বাধাই বুনন কাজে এ বেতি ব্যবহার করা হয়। বেতি থেকে বুননের মাধ্যমে তৈরি শিল্পকে বেতের বুনন শিল্প বলা হয়। বুনন শিল্পের উদাহরণ হলো– ঝাড়ু, কুলা, টুকরি, দোলনা, বাক্স খাট ইত্যাদি, ৪. ক্ষুদ্র হস্ত শিল্প: অল্প পরিমাণ বেত ব্যবহার করে হাতের সাহায্যে তৈরি ক্ষুদ্র ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুতকে ক্ষুদ্র হস্তশিল্প বলে। সাধারণত বেতের নির্মাণ শিল্প ও বুনন শিল্পে বেত ব্যবহারের পর যে ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহারের আর উপযুক্ত থাকে না সে অংশ ক্ষুদ্র শিল্পের কাঁচামাল। ক্ষুদ্র শিল্পের উদাহরণ হলো– খেলনা, ল্যাম্পসেড, কুলা, ফুলের সাজি, মোড়া ইত্যাদি, ৫. মিশ্র শিল্প: বেতের সাথে নির্মাণে ও বুননে অন্য কোনো উপাদান যেমন বাঁশ, কাঠ, প্লাস্টিক, পাটি গাছ, নাইলন, স্টিল ইত্যাদি মিশ্রিত করে কোনো দ্রব্য তৈরি করা হলো তাকে মিশ্র শিল্প বলে। মিশ্র শিল্পের চাহিদাও প্রচুর। মিশ্র শিল্প অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যের শিল্পগুণ বৃদ্ধি পায়। একই সাথে বুনন ও কারুশিল্পের সমন্বয় ঘটানো যায়। সামান্য বেত ব্যবহার করে আকর্ষণীয় দ্রব্য তৈরি করা যায়। বেতের মিশ্রণ শিল্পের উদাহরণ হলো– ফুলের ডালি, মোড়া, দোলনা, চেয়ার ইত্যাদি।

সমস্ত বেতজাত শিল্পই ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের অন্তর্গত। বাংলাদেশের শীতল পাটির যেমন চাহিদা রয়েছে তেমনি বেতজাত রুচিশীল ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টিতে উদ্যোক্তরা এগিয়ে আসলে এ শিল্পের প্রচার ও প্রসার বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। বেত ঝাড় তার অবস্থান থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে। গ্রিন হাউস গ্যাসের অন্যতম কমপোনেন্ট হলো কার্বন ড্রাই-অক্সাইড। বেতের ঝাড় ও ফ্লোর কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখে। অর্থনৈতিক অবদান এবং পরিবেশ সুরক্ষায় বেতের অবস্থান কোনোভাবেই নগণ্য নয়। বেতের ঝাড়-ঝোপ পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থান। এই সমস্ত প্রাণীকূলও পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে।

লেখক: সাবেক সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, আইনজীবী ও প্রাবন্ধিক

গোপন নথিতে বঙ্গবন্ধু

কে সি বি তপু

জাতির পিতার বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার গোপন নথিসমূহ বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের গোপন নথি নিয়ে ১৪ খণ্ডের মধ্যে প্রথম দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অমূল্য এসব ডকুমেন্ট দেশ, জাতি ও বহির্বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াসে *সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান* শীর্ষক ১৪ খণ্ডে বই আকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

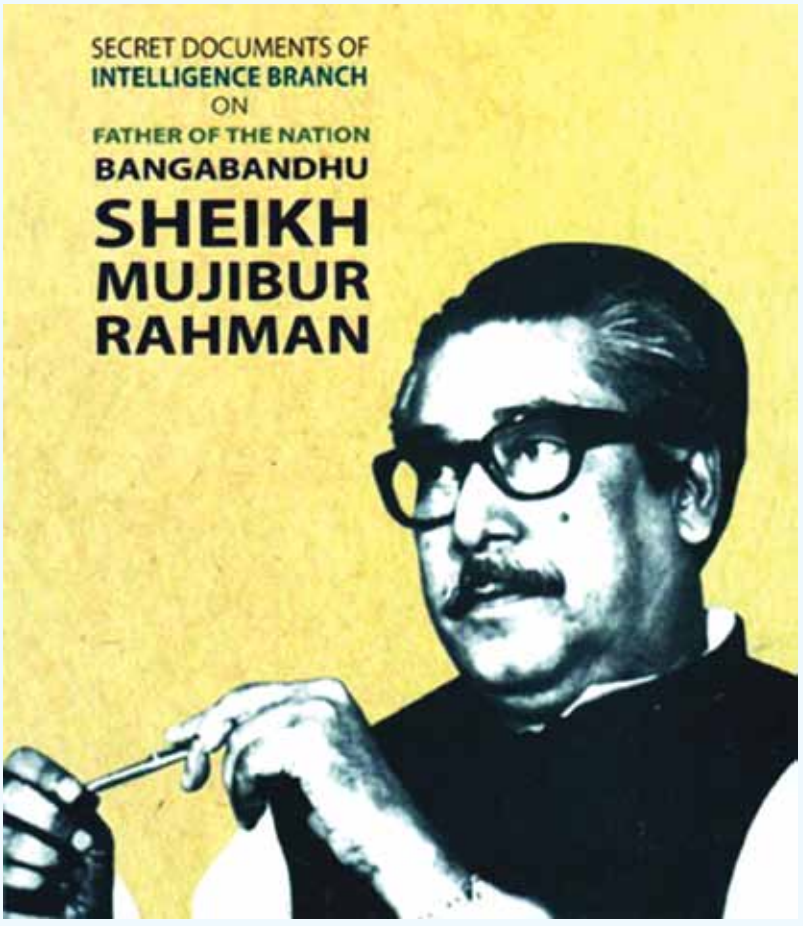

ভাষা আন্দোলনসহ বাঙালির স্বাধীনতার ধারাবাহিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংবলিত *সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান* শীর্ষক বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হয়েছে। ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ গণভবন প্রাঙ্গণে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে মোড়ক উন্মোচন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ছোটো মেয়ে শেখ রেহানা, তাঁর ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যরা। ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। অন্যদের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন– স্পেশাল ব্রাঞ্চে (এসবি) দায়িত্ব পালনের সময় এসব গুরুত্বপূর্ণ দলিল সংগ্রহে সহায়তাকারী বর্তমান পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সদস্যসচিব শেখ হাফিজুর রহমান, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের কিউরেটর মো. নজরুল ইসলাম খান, হাক্কানী পাবলিশার্সের প্রকাশক গোলাম মোস্তফা। এছাড়া জাতীয় সংসদের স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীতে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পাকিস্তানি আমলের গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংকলিত *সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অফ দা নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান* বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের মোড়ক উন্মোচন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বইটি বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাসকে আরো সমৃদ্ধ করবে। এছাড়া এই দলিলে আপনারা অনেক তথ্য পাবেন।

তিনি বলেন, আমি জানি না পৃথিবীতে কেউ এ ধরনের প্রকাশনা করেছে কি-না। কারণ একজন নেতার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট এই সমস্ত তথ্য নিয়ে বই করাটাও সাহসের বিষয়। গোয়েন্দা সংস্থা তাঁকে অনুসরণ করে তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কী করলেন, কী বললেন, কারাগারে থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে যত চিঠিপত্র লিখেছেন এবং যোগাযোগ করেছেন সেসব তথ্য এসব ফাইলে স্থান পেয়েছে। গোয়েন্দা রিপোর্টে অনেক তথ্য রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ২০০৯ সালে যখন আমরা সরকার গঠন করি তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এটা প্রকাশ করার। এ তথ্যগুলো আরো সমৃদ্ধ আকারে বের করার জন্য আমি আইজিপি ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারীকে দায়িত্ব দেই। তার নেতৃত্বে ২০ থেকে ২২ সদস্যের একটা টিম রাত-দিন অত্যন্ত পরিশ্রম করেছে, তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে যারা আমাদের এই বই প্রকাশ করছেন হাক্কানী পাবলিশার্স তাদেরও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এর জন্য আমরা আলাদা একটি অফিস করেছি। এটা মোট ১৪ খণ্ড বের হবে। কাজেই এখান থেকে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারব।

আমাদের প্রতীতি হলো– *সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান* শীর্ষক ১৪ খণ্ড সিরিজের অবশিষ্ট ১২ খণ্ড বই আকারে পর্যায়ক্রমে যথাসময়ে প্রকাশিত হবে। এতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে আরো গভীরভাবে জানার এবং উপলব্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি হবে নিঃসন্দেহে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

আত্মত্যাগের বীরত্বগাথা

ফায়ারম্যান সোহেল রানার প্রয়াণ

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

জন্ম-মৃত্যুর অমোঘ নিয়মে এটাই স্বাভাবিক যে– জন্মিলে একদিন না একদিন মরতে হবে। তবে এই স্বাভাবিকতায় যাঁরা মাহাত্ম্য দান করেছেন– তাঁরা মরেও তাঁদের কাজের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করেছেন। রেখে গেছেন স্মরণীয় ও অনুকরণীয় জীবনাদর্শ। তাঁরা চলে যান কিন্তু থেকে যায় তাঁদের বীরোচিত কর্ম। তাঁদের আত্মত্যাগই তাঁদের বরণীয় করে তোলে। মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো নিজের জীবন। দেশ-জাতির কল্যাণে পরার্থে নিজ জীবন উৎসর্গ করাই হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম– যা সবচেয়ে কঠিন কাজ। এমনি কঠিন কাজে ব্রতী হয়ে ফায়ারম্যান সোহেল রানা অন্যের জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে বর্তমান সময়ে স্থাপন করেছেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি দেখিয়েছেন অসীম সাহসিকতায় আত্মত্যাগের এক অনন্য নজির।

২৮শে মার্চ ২০১৯ ঢাকা মহানগরের বনানীর এফ আর টাওয়ারে

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ছুটে যান আগুন নেভানো ও আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করতে। ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মীদলে ছিলেন কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশনের ফায়ারম্যান সোহেল রানাও। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের উঁচু ল্যাডারে উঠে আগুন নেভানোর পাশাপাশি ভবনে আটকে পড়াদের উদ্ধারে সক্রিয় ছিলেন সোহেল রানা। অসীম সাহসিকতায় অগ্নিকুণ্ড থেকে জীবন বাঁচিয়েছেন অনেকের। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আটকে পড়া মানুষের জীবন বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন তিনি। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য ৫ই এপ্রিল তাকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়। সেখানে জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ই এপ্রিল তার মৃত্যু হয়। অন্যের জীবন বাঁচাতে গিয়ে অকাতরে বিলিয়ে দিলেন নিজের জীবন। তার মৃত্যুতে কেঁদেছে পুরো দেশ।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মী সোহেল রানার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, ফায়ারম্যান সোহেল রানা মানবসেবায় আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা সকলের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রপতি তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোকবার্তায় বলেন, অন্যের জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে সোহেল রানা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী তার বার্তায় মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য মন্ত্রীসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। আমরাও তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে জানাই গভীর সমবেদনা।

পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী– সোহেল রানার জন্ম কিশোরগঞ্জের প্রত্যন্ত হাওরের এক প্রান্তিক কৃষক পরিবারে। দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে তাকে বেড়ে উঠতে হয়েছে। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার চৌগাংগা ইউনিয়নের কেরুয়ালা গ্রামের প্রান্তিক কৃষক নূরুল ইসলামের ছেলে। তার মায়ের নাম হালিমা খাতুন। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ভাইদের মধ্যে সবার বড়ো সোহেল রানা। বড়ো বোন সেলিনা আক্তার বিবাহিত, ছোটো তিন ভাইয়ের মধ্যে রুবেল মিয়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক প্রথমবর্ষের ছাত্র, উজ্জ্বল মিয়া করিমগঞ্জ সরকারি কলেজে বিবিএ তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং সবার ছোটো দেলোয়ার হোসেন চৌগাংগা শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা নূরুল ইসলাম প্যারালাইসিসের রোগী।

জানা যায়, সোহেল রানা স্থানীয় কেরুয়ালা জামে মসজিদে কোরান শিক্ষা, চৌগাংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে চৌগাংগা শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১০ সালে এসএসসি পাস করেন। এরপর অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায় তার লেখাপড়া। এ সময়ে অটোরিকশা ও টমটম চালিয়ে পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে দুবছর পাঠবিরতির পর করিমগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে ২০১৪ সালে এইচএসসি পাস করেন। এইচএসসি পাসের পর ২০১৫ সালের মাঝামাঝিতে সোহেল রানা ফায়ারম্যান হিসেবে যোগ দেন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সে। ট্রেনিং শেষে মুন্সীগঞ্জে প্রথম যোগদান করেন। সেখানে মাস চারেক দায়িত্ব পালন করার পর তিনি কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশনে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সোহেল রানার ছোটোভাই রুবেল মিয়া সাংবাদিকদের জানান, সর্বশেষ গত ১৫ই মার্চ ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন সোহেল রানা। ছুটি শেষে ২৩শে মার্চ তিনি কর্মস্থলে যোগ দেন। কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার মাত্র ৫ দিন পরেই ২৮শে মার্চ ঘটে বনানীর এফ আর টাওয়ারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের মর্মন্তুদ ঘটনা। তিনি আরো বলেন, ভাই-ই ছিলেন আমাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যু আমাদের স্তব্ধ করে দিয়েছে। সামনে আমাদের জীবন অন্ধকার। এখন একমাত্র সরকারই পারে আমাদের এই অকূলপাথার থেকে বাঁচাতে।

পৃথিবীতে কিছু মানুষ রয়েছেন, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যকে বাঁচান, মানুষের কল্যাণে সবসময় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ফায়ারম্যান সোহেল রানার আত্মত্যাগ আমাদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি উদ্ভাসিত হয়েছেন বীরের মহিমায়। তার আত্মত্যাগ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি সত্যিকারের বীর। বীরের মৃত্যু নাই। অক্ষয় হোক তাঁর আত্মত্যাগ। বিশ্বকবির ভাষায়–

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই–
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'।

লেখক: সংগঠক, সমাজচিন্তক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস

জান্নাত হোসেন

প্রতিবছর ৩১শে মে বিশ্বজুড়ে পালন করা হয় বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস। বিশ্বজুড়ে ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা ধরে তামাক সেবনের সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে বিরত থাকাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য দিবসটি প্রচলিত হয়েছে। এছাড়াও দিবসটির উদ্দেশ্যে তামাক ব্যবহারের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব এবং স্বাস্থ্যের নেতিবাচক প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ– যা বর্তমানে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হিসেবে বিবেচিত এবং যার মধ্যে ধূমপানের পরোক্ষ ধোঁয়ার কারণে প্রায় ৬,০০,০০০ অধূমপায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ১৯৮৭ সালে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস চালু করে। তখন থেকে আজ অবধি দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

তামাক জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বিশ্বের সকল প্রতিরোধযোগ্য রোগের অন্যতম প্রধান কারণ তামাক। তামাকের কারণে সারাবিশ্বে প্রতি ৬ সেকেন্ডে একজন লোক ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, হাঁপানিসহ ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি নানা রোগে মৃত্যুবরণ করে। এছাড়া অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা হারায়, যার প্রভাব পড়ে তার পরিবার ও সমাজে। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্য ও জাতীয় অর্থনীতির জন্য হুমকি স্বরূপ। তামাকের ব্যবহার হ্রাস করতে পারলে তামাকজনিত মৃত্যু কমে আসবে এবং জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতির উন্নয়ন হবে। বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাতে তামাক নিয়ন্ত্রণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আর প্রতিবছর এ দিবসটি পালন করার মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট রোগ, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি সম্পর্কে জনচেতনতা সৃষ্টি করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা। কারণ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রথমেই প্রয়োজন একটি সুস্থ সবল জনগোষ্ঠী। এলক্ষ্যে প্রয়োজন দেশব্যাপী তামাকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলা। তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে নানা ধরনের রোগের কারণে যে অর্থ ব্যয় হয়, তা দেশের উন্নয়নে লাগালে তা দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে। তামাক ব্যবহারজনিত ব্যাপক মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম অন্তরায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারকারী পরিবারগুলোর মাসিক খরচের পাঁচ শতাংশ তামাক ব্যবহারে এবং ১০ শতাংশ তামাক ব্যবহারজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যয় হয়। কাজেই তামাক ব্যবহারে দরিদ্র মানুষ আরো দরিদ্র হয়। তামাক সেবন না করেও তামাক ব্যবহারে পরোক্ষ শিকার হচ্ছে তামাক সেবীদের পরিবার, আত্মীয়স্বজনরা। বাংলাদেশে তামাক ব্যবহার না করেও পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে প্রায় এক কোটি নারী। এই বিপুল বৈষম্য থাকলে টেকসই উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। তাছাড়া তামাক ব্যবহারের কারণে কর্মক্ষম মানুষের বিরাট অংশ অকাল মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের শিকার হন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, হৃদরোগজনিত মৃত্যুর প্রায় ১২ শতাংশের জন্য দায়ী তামাক ব্যবহার এবং পরোক্ষ ধূমপান। হৃদরোগের কারণ হিসেবে উচ্চ রক্তচাপের পরেই তামাকের অবস্থান।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যুর পরিমাণ বছরে ৮০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। এই মৃত্যুর মিছিল শতকরা ৮০ ভাগই হবে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। তাছাড়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা শহরের তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি হলেও পাবলিক প্লেসে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়ার চিত্র ঠিক উলটো। শহরের আবদ্ধ স্থানে বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপান।

বর্তমান সরকার জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি সংশোধন করে। এরপর ২০১৫ সালে প্রকাশ করে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা। আইন ও বিধি বাস্তবায়নে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি, তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণ নীতি, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুদের কাছে তামাকজাতদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব নীতি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে সরকার। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের পাশাপাশি সিটি করপোরেশন, পৌরসভাসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমাদের প্রয়োজন একটি সুস্থ-সবল জনগোষ্ঠী। এজন্য বাংলাদেশ সরকার ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বিশ্ব তথ্য সমাজ দিবস

বিশ্ব তথ্য সমাজ দিবস একটি আন্তর্জাতিক দিবস। তিউনিসে অনুষ্ঠিত ২০০৫ সালে তথ্য সমাজের উপর বিশ্ব সম্মেলনের পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত একটি প্রস্তাবনার মাধ্যমে ১৭ই মে বিশ্ব তথ্য সমাজ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দিবসটি পূর্বে ১৭ই মে, ১৮৬৫ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার স্মৃতিরক্ষা বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৭৩ সালে মালাগা-টরেসোলিনসে আয়োজিত এক পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সম্মেলনে প্রবর্তিত হয়।

এই দিবসের প্রধান প্রতিপাদ্য– ইন্টারনেট এবং নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তনের বৈশ্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস করার লক্ষ্যেও কাজ করে থাকে।

প্রতিবেদন: জাহানারা বেগম

জলরঙের ছবি

সেলিনা হোসেন

জয়তুন বেওয়ার জীবন আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর আগে দিনগুলো একরকম ছিল। এখন অন্যরকম হয়েছে।

আগে পদ্মা নদী ওর কাছে একটি নদী মাত্র ছিল। এখন সেটা ওর কাছে আশ্রয়ের মতো। নদীর পাড়ে বসে দিনের খানিকটুকু সময় কাটালে বুঝতে পারে স্বামীর মৃত্যুশোক একটু লাঘব হলো। জয়তুন বেওয়ার জীবনে এভাবেই একজন মানুষের চলে যাওয়ার হিসাবনিকাশ শেষ হয়। ও নতুন সময়কে আঁকড়ে ধরে।

মাঝে মাঝে জয়তুন বেওয়া নিজেকে বুঝতে পারে না। যে নদী স্বামীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, পরে খুঁজে পাওয়া যায় তার লাশ, সেই নদীকে আপন ভাবা কেন? আবার ভাবে, নদীতো তার স্বামীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি, তার কাছে ফিরিয়ে এনেছে। জীবিত ফিরিয়ে আনতে পারেনি। এনেছে মৃত।

এই ভাবনায় তার বুক ভেঙে যায়।

চিৎকার করে ওঠে, ওহ নদীরে

বিলাপ করে কাঁদে জয়তুন বেওয়া।

কোনো কোনো দিন দিনের শুরুতে কান্না আসে। সামনে থাকে অনেক কাজ। বাড়িতে দুটো গরু আছে। দুধ দুইয়ে গোয়ালাকে দিতে হবে। হাঁস-মুরগি আছে। খোঁয়াড় থেকে বের করতে হবে। খুদকুঁড়ো দিতে হবে। উঠোন ঝাড়ু দিতে হবে।

সব কাজ ফেলে রেখে কাঁদতে থাকে জয়তুন। নইলে দুই পা মেলে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে। মাকে এই অবস্থায় দেখলে রাগ করে জয়তুন বেওয়ার কিশোরী মেয়ে সেউতি। বাবাতো মরেই গেছে তারজন্য সব কাজ ফেলে কান্নাকাটি করতে হবে কেন? বাবাতো আর কোনোদিন ফিরবে না। ওরওতো বাবার কথা মনে থাকে, বাবার স্মৃতিতে ওর আনন্দ আছে, বাবা না থাকায় চোখ ভিজে যায়। কিন্তু তাই বলে কাজকর্ম বাদ দিয়ে বসে বসে কাঁদতে ও একদমই চায় না।

আজও মায়ের কাছে এসে বসে। মায়ের হাত ধরে। ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কেঁদে কি হবে? আব্বা কি ফিরে আসবে?

মেয়ের কথায় সাড়া দেয় না জয়তুন বেওয়া।

জীবনের বোঝা যে কত কঠিন এটুকু মেয়ে তা বুঝবে কি করে? দু'হাতে চোখের পানি মুছে জয়তুন বেওয়া মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, দুঃখের বোঝা ঘাড়ে থাকলে কাঁদতে তো হয়ই।

ঘাড়ে না রেখে ঝেড়ে ফেল।

কাকে? দুঃখকে?

হ্যাঁ, তাই। একজন মানুষ আর একজনের জন্য সারাজীবন বসে থাকে না।

আমি তোর মতো কঠিন না রে মেয়ে।

ছুটতে ছুটতে আসে বারো বছরের আল আমীন।

মা খিদা লাগছে, ভাত দে।

একমুহূর্ত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুই রোজ রোজ কাঁদলে আমি গরু নিয়ে পদ্মা নদীতে নামব।

না, না বাজান।

জয়তুন বেওয়া ছেলেকে জড়িয়ে ধরে।

না, তুই নামবি না। আমার মাথা ছুঁয়ে বল যে নামবি না।

না, তোর মাথা ছুতে পারব না। তুই আমাকে ভাত দে।

আয়। জয়তুন বেওয়া উঠে দাঁড়ায়।

এখনো তেমন বেলা হয়নি। রোদে ভেসে থাকছে না উঠোন। আলতু আর ফরিদ এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। ওরা উঠলে জয়তুন বেওয়ার কাজ বাড়বে। কাজ শেষ হলে ওদের নিয়ে নদীর ধারে যাবে। ছোটো ছেলেমেয়ে দুজনই নদীর ধারে যেতে চায়। ছুটোছুটি করে। জয়তুনের চেয়ে বেশি কে জানে যে ওরা কিছুদিন ছুটোছুটি করবে তারপর উপার্জন করতে নামবে। মানুষের বাড়িতে গরু চরানোর কাজ, খেত-খামারে দিনমজুরি-আম বাগানে পাহারাদারি-ঘরের কাজের বুয়া-করতে করতে একদিন ওরা বড়ো হবে-নিজেদের সংসার হবে। সংসারের ঘানি টানতে-টানতে-টানতে-। জয়তুন বেওয়া বুঝে যায় যে ও নিজের জীবনে পৌঁছে গেছে। ও আর আলতুর ছায়ায় নেই।

জয়তুন পদ্মা নদীর পাড়ে এসেছে।
শৈশব থেকে এই নদীর পাশাপাশি বড়ো হয়েছে জয়তুন। ওর বাবার বাড়ি তারাপাশা। স্বামীর বাড়ি মোহনপুর। পদ্মা নদীর পাড়ের গ্রামে। অপর পাড়ে ইন্ডিয়া। ছোটোবেলায় একদিন রুস্তুমকে বলেছিল, মনে হয় নদীটা সাঁতার দিয়ে ওই পাড়ে চলে যাই।
ওখানে গিয়ে কি করবি?
জঙ্গলে ঘুরে দেখব ফলপাকুড় কী আছে। ফুল পেলে বেনিতে লাগাব। আর খরগোশের বাচ্চা পেলে ঘাস দিয়ে মাথায় বেঁধে বাড়িতে নিয়ে আসব।
রুস্তুম দাঁত কেলিয়ে হে-হে করে হেসে বলেছিল, নদীর ওই পাড় আমাদের দেশ না।
তবে কার দেশ?
অন্যদের দেশ। ওই দেশের নাম ইন্ডিয়া। ওখানে গেলে তোকে পুলিশে ধরবে।
কেন? ধরবে কেন? আমিতো আবার চলে আসব। আমি তো থাকব না। একদিনও না।
আমি বেশি কথা জানি না। শুধু জানি অন্য দেশে যেতে হলে পাসপোর্ট লাগে।
পাসপোর্ট? সেইটা আবার কি?
ধুর বোকা, শুধু শুধু কথা বলিস না। আমিও বেশি কিছু জানি না। শুধু জানি পুলিশের হাতে ধরা পড়লে মার খেতে হবে। মারের চোটে মরেও যায় কেউ কেউ।
বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়েছিল জয়তুন। সেই বিস্ময় নিজের জীবনে এসে ঠেকেছে। এজন্যই আবদুল হান্নানের মৃত্যুর ঘোর কাটছে না। ইন্ডিয়ার জলপুলিশের হাতে মার খেয়েইতো মরে গেল হান্নান। ওর দুঃখ শৈশবের সঙ্গে যৌবনের এক হয়ে যাওয়া-ওর দুঃখ শৈশবের বিস্ময়ের সঙ্গে মৃত্যুর এক হয়ে যাওয়া। ওর মনে হয় এই ঘোর থেকে ও সারাজীবনে আর বের হতে পারবে না।
মাঝে মাঝে গাঁয়ের কেউ ভুল সংশোধন করে দিয়ে বলে, যারা মেরেছে তারা ইন্ডিয়ার পুলিশ না। ওরা বিএসএফ। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী।
আমি অত কিছু বুঝি না। আমার শুদ্ধ করে বলারও দরকার নাই। তোমরা আমাকে শেখাতে এসো না।
দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিবেশীরা মাথা নাড়ায়।
ওনাকে এত পড়ালেখা শেখাতে হবে না। ওই লোকগুলো পুলিশ হোক আর বিএসএফ হোক মানুষটাকেতো মেরে-পিটিয়ে শেষ করে দিয়েছে।
এখন নদীর ধারে বসে আবার কাঁদতে শুরু করে জয়তুন। চোখ মোছার সময় মনে পড়ে আবদুল হান্নানের কথা।
বলেছিল, দিনমজুরির কাজে শরীর বাঁকা হয়ে আসে রে বউ। আর পারি না।
কি করবে তাহলে?
গরুর নদী পাড়ের কারবারিতে ঢুকব।
পদ্মা নদী সাঁতরায়ে গরু আনবে?
তাইতো। গরু আনা কারবারিতো এই নদী-পথেই হয়।
নদীতে স্রোত অনেক না?
হ্যাঁ, অনেকতো।
ডর লাগে না?
লাগলে কি করব, পেট ভাত চায় তো। চায় না?
জয়তুন মাথা নেড়ে বলেছিল, চায়। পেটতো একটা না, ছয়টা।
আবদুল হান্নান হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার মনে হয় মজাই লাগবে। নদী সাঁতরে ইন্ডিয়ার মালদহে যাব। আবার গরুর লেজ ধরে ভাসতে ভাসতে এপারে আসব। তুমি নদীর ধারে দাঁড়ায়ে থাকবে বউ।
জানব কেমন করে যে তুমি কখন আসবে?
আবদুল হান্নান মাথা নেড়ে বলেছিল, তা জানা যাবে না।
সেই রাত দুজনে খুনসুটি করে কাটিয়েছিল। সংসারে অভাব থাকলেও মানুষটাকে নিয়ে জয়তুন বেওয়ার কোনো অভিযোগ ছিল না। দিন তো বেশ কেটে যাচ্ছিল।
পরদিন মহাজনের সঙ্গে দরদাম ঠিক করে আবদুল হান্নান নদী সাঁতরে মালদহ সীমান্তে পৌঁছে গেল। এক জোড়া গরু বা মহিষ আনতে পারলে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা পাওয়া যায়। হান্নান নতুন বলে পাঁচ হাজার টাকায় দরদাম ঠিক হয়। মনের আনন্দে পদ্মা সাঁতরে অপর পারে যেতে কোনো অসুবিধে হলো না। ওপারের দালালরা মহাজনের গরু ঠিক করে দিল।
এপার থেকে যাওয়ার সময় আবদুল হান্নান জেনে গিয়েছিল কীভাবে নদী পথে গরু আনে মহাজনেরা। তারা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিল ওকে যে কীভাবে গরু আনতে হবে। তাছাড়া যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের কাছেও শুনে অনেককিছু জেনে নিয়েছিল। আবদুল হান্নান ধরে নিয়েছিল যে এই কাজটি করা তারজন্য কঠিন হবে না। গরু বা মহিষ কেনার কাজ হবে ভারতের সীমান্তের ভেতর। গরু বিক্রি করবে ওরা, ভারতের লোকেরা। কিনবে বাংলাদেশের লোকেরা। গরু নিয়ে ওদেরকে আসতে হবে বাংলাদেশের ভেতর। বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীরা দেশে গরু আনার জন্য ট্যাক্স নেবে। টাকা আদায় হলে ওরা গরু-মহিষের গায়ে সীল দেবে। তখনই এগুলোকে দেশে আনার কোনো বাধা থাকবে না। আনা হবে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী। বৈধ ভাবে।
সমস্যা হলো নদী পথ।
গরু আনতে হয় নদী পথে। ভুল করে নদী পথে ভেসে ভারতের সীমান্তে চলে গেলে ভারতের জলপুলিশ ওদেরকে ধরে। ধরে মারধোর করে। কখনো জেলে পাঠিয়ে দেয়। গরুর কোনো খোঁজ থাকে না।
এই পথে টাকা রোজগারের পাশাপাশি বিপদও আছে। এই বিপদের কথা জয়তুন বেওয়া জানতো। একবার ওদের গাঁয়ের একজন গরু আনতে গিয়ে পদ্মা নদীতে ভেসে গিয়েছিল। কেউ আর ওর খোঁজ পায়নি। দুঃখিনী হাসমত বেগম এখনো কপাল চাপড়ায়। বলে, বেশি টাকার লোভে পড়ে লোকটা ওইপথে গেল। এরচেয়ে দিনমজুরি করাই ভালো ছিল। দিনমজুরিতে মরণের পথ খোলা থাকে না।
আবদুল হান্নানকে এই কথা বললে ও বলে, গরিবের মরণের পথ সবখানে খোলা। বেশি কথা বলবে না বউ। আগে তো বাঁচা, তারপর মরণ। নদীর পানিতে ভাসার মধ্যে সুখ আছে। দিনমজুরিতে সুখ নাই। কেবল কষ্ট।
যে মানুষের জীবনে কষ্ট প্রবল তাকে কেন সুখ পেতে বাধ সাধবে জয়তুন বেওয়া? তার কি সাধ্য কষ্ট দূর করার? কপালে যা আছে তাই হবে, এমন প্রবাদ বাক্যটি মেনে জয়তুন বেওয়া দেখেছিল আরো কয়েকজন মানুষের সঙ্গে নদীপথে যাত্রা করে আবদুল হান্নান।
ফিরেও এসেছিল পাঁচদিন পরে।
সঙ্গে এনেছিল একজোড়া মহিষ।
মহাজন পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল। খুশি মনে বাড়ি ফিরে জয়তুনের হাতে টাকা দিয়ে বলেছিল, হিসাব করে খরচ করবে। এই কাজ সারামাস থাকবে না। টাকা শেষ হলে আমাকে দিনমজুরির কথা বলবে না।
একটু জিরিয়ে আবার বলেছিল, ওই কথা বললে আমার যেইদিকে দুইচোখ যায়, সেইদিকে যাব।
জয়তুন হাসতে হাসতে বলেছিল, না, আমি তোমাকে দিনমজুরির কথা বলব না। দরকার হলে আমি ক্ষেতে ধান লাগানোর কাজ করব। তুমি চুলা সামাল দিও।
কি, কি বললে? আমি চুলা সামাল দিব?
দু'চোখ কপালে তুলেছিল আবদুল হান্নান।
জয়তুন হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। ওর বাধ-ভাঙা হাসির তোড়ে আবদুল হান্নান কথা বলতে পারেনি। জয়তুনের স্বভাবই ছিল এমন। যখন হাসত ইচ্ছে মতো সময় নিয়ে হাসতো। কেউ ওকে থামাতে পারত না।
সেদিন হাসি থামলে জয়তুন দু'চোখে ঝিলিক তুলে বলেছিল, আমি

ক্ষেতের কাজ পারলে তুমি চুলার কাজ পারবে না কেন গো?
ঠিকই বলেছিস বউ। আমিও পারব।
তারপর বড়ো করে শ্বাস ফেলেছিল। বলেছিল, চুলার কাজও দিনমজুরি। কষ্টের।
সেদিন আবদুল হান্নানের জন্য খুব মায়া হয়েছিল জয়তুন বেওয়ার। মানুষটা অনেক বুঝদার ছিল।
পরে আরো একদিন বলেছিল, বউ টাকাগুলো জমাও। যদ্দুর পার অদ্দুর জমাও। কোনদিন পদ্মার স্রোতে ভেসে যাব, কে জানে! নদীরে বিশ্বাস নাই। শোনো নাই নদী একূল ভাঙে ওকূল গড়ে।
সেদিনও জয়তুন বেওয়া প্রাণ খুলে হেসেছিল। হাসতে হাসতে আকাশ-পাতাল ভরিয়ে ছিল।
আবদুল হান্নান হাঁ করে ওকে দেখেছিল। অবাক হয়েছিল। বিব্রতও। তারপর জয়তুনকে বলেছিল, বউ রে গরিবের ঘরে এত হাসি মানায় না রে।
হাসি আল্লাহর দান। হাসিতে তো কোনো খরচ লাগে না।
দপ করে নিভে গিয়েছিল জয়তুনের হাসি। গরিবের হাসি মানায় না -কথাটি ওর বুকে খুব বিঁধেছিল। কেন মানায় না, এমন প্রশ্ন ও আবদুল হান্নানকে করেনি।
আজ সকালে পদ্মার ধারে বসে কাঁদতে কাঁদতে ওর সময় কাটে। দুশ্চিন্তা ওকে ঘিরে রাখে। ছেলেমেয়েদের ভাবনায় ম্রিয়মান থাকে -ওর বুক থেকে হাসি শুকিয়ে গেছে। পদ্মায় যেমন বালু পড়ে, চর জাগে তেমন ওর অবস্থা। ভয়ে ওর বুক শুকিয়ে গেছে।
দুই ছেলেমেয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়।
মা বাড়ি চলেন।
যাব। তোরা খেল।
ভাত রাঁধবেন না?
রাঁধবো তো।
দেরি হলে খিদা লাগবে।
না, রে রাঁধতে দেরি হবে না। যা, আর একটু খেলে আয়।
আজ কি রাঁধবেন মা?
দেখি কি রাঁধি।
তাইলে বাজারে চলেন। রুই মাছ কিনবেন।
বড়ো একটা হাঁসও। মা বাজারে চলেন।
বাজার!
জয়তুন ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে খুব অসহায় বোধ করে। কখনতো এত নিচুকণ্ঠে কথা বলেনি ও। আজ ওর কি হলো? কোথায় জোর চলে গেল?
ছেলেমেয়েরা আবার জিজ্ঞেস করে, মা বাজারে যাবেন না?
জয়তুন চুপ করে থাকে।
মাগো, আপনের কাছে টাকা নাই? আপনি চুপ করে আছেন কেন?
আমার কাছে টাকা আছে বাবা। আমি তোমাদের জন্য রুই মাছ কিনব। হাঁস কিনব। চল বাড়ি যাই।
বাড়িতে যাবেন কেন?
টাকা আনতে যাব।
আচ্ছা চলেন।
বাড়ি ফেরার পথে পা ভেঙে আসে জয়তুনের। টাকা জমাতে বলেছিল আবদুল হান্নান। জয়তুন ওর কথা শুনেছিল। ও মাটির হাঁড়িতে টাকা জমাতো। টাকাগুলো খড় দিয়ে ঢেকে রাখত। চট করে কেউ বুঝতে পারত না যে হাঁড়ির মধ্যে কি আছে।
ওই হাঁড়ি থেকে টাকা নিয়ে হাঁস কিনে আনবে ছেলেমেয়েদের জন্য। বছরের দু'চারটা দিন ভালো খাবার না দিলে ওরা শক্তি পাবে কোথা থেকে? আনন্দই বা পাবে কোথায়? বাপ নেই বলেতো ছেলেমেয়েরা একদম এতিম হয়নি। মাতো আছে। কিন্তু সে থাকা কি থাকা? জয়তুনের বুক থড়ফড় করে। আবদুল হান্নানের কথা মনে হয়-গরিবের এত হাসি মানায় না। জয়তুন চোখ মুছতে মুছতে বাজারে যায়।
রাতে হাঁসের মাংস দিয়ে ভাত খায় সবাই।
আল আমিন খেতে খেতে বলে, রোজ রোজ হাঁস রাঁধতে পারেন না? নইলে গরুর গোস্ত?
সেউতি দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, বল নইলে খাসির গোস্ত, মুরগি, কবুতর, রুই মাছ, কোরাল মাছ, পোলাও-কোর্মা, পায়েস-জরদা? তোমার এত রাগ কেন?
আমিতো পরের বাড়ি কাজ করি। বাড়ি আসার সময় এক গামলা ভাত দেয়। খাটতে খাটতে আমার আর বাঁচার ইচ্ছা হয় না। আমি একদিন নদীতে ডুবে মরব।
ঢং, আমি কাজ করি না? আল আমিন ভাতের থালা ঠেলে দেয় সামনে। আমি রোদে ঘুরে গরু চরাই না? ঘাস কাটি না? গোয়াল সাফ করি না? গোবর ঘাটি না? আমারও মরতে ইচ্ছা হয়।
ছোটো দুজনের মুখে কথা নেই।
আলতু কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে, আর কয় বছর পরে বুবুর মতো আমারও কাজ করতে হবে।
ফরিদও একই ভঙ্গিতে বলে, আমিই বা কত বড়ো হব? কাজ করার জন্য আর কত বড়ো হবো?
জয়তুন দেখতে পায় হাঁসের মাংসে ভীষণ মাছি। মাছির ঠেলায় বন্ধ হয়ে গেছে খাওয়া-দাওয়া। ওর বুকে দম ধরা স্তব্ধতা।
সেউতি আবার জোরে জোরে বলে, বাবা যে কেন মরে গেল!
ও বাবা গো-বলতে বলতে আল আমিন দু'হাতে মুখ মোছে।
জয়তুন মাথায় হাত দিয়ে বলে, ভাত খা বাবা।
আল আমিন হাত গুটিয়ে বসে থাকে।
সেউতি ছোটোদের মাথায় হাত রেখে বলে, ভাত খা। তোরা না হাঁসের মাংস খেতে চেয়েছিলি।
হাঁসের মাংস ভালো না। আমরা খাব না।
আলতু বলে, হাঁসের মাংসে পচা গন্ধ। জয়তুন দেখতে পায় কুপির মিটিমিটি আলো থাকার পরও ঘরজুড়ে অন্ধকার। হাঁসের মাংস অন্ধকারের স্তূপ হয়ে সবকিছু আড়াল করেছে। মানুষগুলোকেও। ও সেউতির মাথায় হাত দিয়ে বলে, ভাত খা মা। কত কষ্ট করে হাঁসটা রাঁধলাম-
রাঁধছেন কেন? গরিবের এতকিছু খাওয়া সাজে না।
জয়তুনের বুক ধ্বক করে ওঠে। ঠিক বাপের গলায় কথা বলছে মেয়েটা। আসলে কোথাও কিছু নেই। শুধু আবদুল হান্নানের স্মৃতি। এই স্মৃতি ওদের জীবনে এখন গাঢ় অন্ধকার।
জয়তুন আল আমিনের প্লেট থেকে একমুঠো ভাত নিয়ে ওর মুখে দেয়। ও মুখ ঘুরিয়ে বলে, লাগবে না। আমি নিজে খাব।
ছোটো দুজনকে ভাত দিতে গেলে ওরা বলে, হাঁসের মাংস শক্ত। চাবাতে পারি না।
সেউতি ধমক দেয়, কে বলেছে শক্ত? খা বলছি। শুধু মিছা কথা।
দুজনে ভয়ে হাঁসের মাংসের টুকরো কামড়ে ধরে। জয়তুন আবার চোখ মোছে। সেউতির ভয়ে কাঁদতে পারে না।
আল আমিন থালার ভাত শেষ করে বলে, এই দিনমজুরির কাজ আর করব না। এক বছরের মাথায় নদীপথে গরু আনব। কামাই বাড়বে।
কামাই!
আল আমিন মায়ের দিকে তাকায় না। উঠে দাঁড়ায়।
সেউতি বলে, কি বললি? কামাই!
হো-হো করে হাসতে হাসতে আল আমিন বলে, কামাই তো! রোজ রোজ হাঁস খাওয়ার কামাই।
ও একলাফে ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে যায়। চিৎকার করে গান গায়-ও বন্ধুরে, পীরিতের এত জ্বালা-। গান গাইতে গাইতে ও বাড়ির বাইরে চলে যায়। ওর কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না।
সেউতি হাসতে হাসতে বলে, আপনার ছেলে পেকেছে মা। সামাল দিতে কি পারবেন?
জয়তুন বেওয়া চুপ করে থাকে। মেয়ের দিকে তাকায় না। মুখ নিচু

করে রেখে বলে, তোকে আর এক চামচ ভাত দি?
সেউতি ঘাড় কাত করে থালা এগিয়ে দেয়।
জয়তুন ওকে দুই-তিন চামচ ভাত দেয়। দু'টুকরো মাংস আর আলুও দেয়। সেউতি ফিক করে হেসে বলে, মায়ের আদর মিঠা পানি। বাপের মরণ নোনা পানি।
মেয়েটা মাঝে মাঝে এমন করেই কথা বলে। ফরিদ আর আলতুর খাওয়া হয়েছে। ওরা উঠে চলে যায়।
আপনিও খান মা।
সেউতির কণ্ঠস্বর বুঝি নদীর বাতাস বয়ে আনে। চোখ ছলছল করে জয়তুনের।
মাগো আমি আপনার থালায় ভাত দেই।
না, মা। খিদা নাই। ভালো লাগে না।
সেউতি কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, খিদা আছে। মিছা কথা বলেন কেন আম্মা? আমি সব বুঝি। আমারও পাকার বয়স হয়েছে।
জয়তুন নিজের থালা বাড়িয়ে দেয়। সেউতি হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে দেয় মায়ের থালায়। থালা ভর্তি করে ভাত দেয়। ওর মনে হয়, মায়ের পেটে আজ অনেক খিদে। হাঁসের মাংস আলু ঝোল দিয়ে ভরিয়ে দেয় ভাতের সবটুকু।
এত দিলি?
পারবেন খান।
তারপর নিজের থালার দুই লোকমা ভাত খেয়ে ঢকঢকিয়ে পানি খায়। থালা হাতে করে উঠে যেতে যেতে বলে, আমি গেলাম। পুরা পাকঘর আপনার আম্মা। আপনি আব্বার কথা মনে করে কাঁদবেন আর ভাত খাবেন। খেতে খেতে রাত হলে ক্ষতি নাই।
সেউতি বের হয়। রান্নাঘরের দরজার ঝাঁপ টেনে দেয়। বাড়িতে কেউ নেই। গরু না। হাঁস-মুসগিও না। ফরিদ আলতুও বের হয়েছে। ও কি কোথাও যাবে? না। ও বারান্দায় বসে থাকে। ভাবে মায়ের জন্য কারো অপেক্ষা করা উচিত। বাড়িতে তো ও একাই আছে।
জয়তুন ভাত খায়। টের পায় খুব খিদে পেয়েছে। দুই-চার লোকমা খাওয়ার পরে চারদিক অন্ধকার লাগে। ভাতের থালার ওপর হাত আটকে যায়, যেন ওর ডান হাতটা আবদুল হান্নান হয়ে পদ্মা নদী সাঁতরাচ্ছে। জয়তুনের কাছে এটি এখন আগস্ট মাসের এক রাতের গল্প। বিভিন্ন জনের কাছে নানাভাবে শুনতে শুনতে গল্প এখন রূপকথা।
আগস্ট মাস। বর্ষাকাল। শ্রাবণ মেঘের মাস। ফুলেফেঁপে প্রমত্ত পদ্মা কীর্তিনাশার চেহারায় গর্জন করে ছুটছে। তারপরও নদীকে ভয় নেই। স্রোতের অনুকূলে ভাসতে থাকলে ঠিকঠাক মতো পৌঁছে যাবে মনোহরপুর ঘাটে। ভয় নেই আবদুল হান্নানের। এরমধ্যে বেশ কয়েকবার পারাপার করা হয়েছে তার। নিরাপদে এক দেশের সীমান্ত থেকে আর এক দেশের সীমান্তে পৌঁছে গেছে।
রাতের অন্ধকার মাথায় নিয়ে নদীতে নেমে পড়েছিল আবদুল হান্নান। দু'হাতে ধরে রেখেছিল দুই গরুর লেজ। গরুর লেজই নদীপথ পাড়ি দেওয়ার একমাত্র ভরসা। ভাসতে ভাসতে ভাসতে-আবদুল হান্নান অনেকদূর চলে আসে। একদম মাঝ নদীতে। কোথা থেকে কি হয় বুঝতে পারে না। দেখতে পায় স্পিডবোট নিয়ে তাকে তাড়া করছে ভারতীয় জলপুলিশ। একসময় তাকে ধরে ফেলে ওরা। ও গরুর লেজ ছেড়ে দেয়। তাতেও রক্ষা নেই। পুলিশ তাকে বোটের ওপর ওঠায়। মারতে থাকে। মারতেই থাকে। ওরা কি ভাষায় কথা বলে তা ও বুঝতে পারে না। মার খেয়ে অচেতন হয়ে যায় ও। একসময় লাথি দিয়ে ফেলে দেয় নদীতে।
নদী তাকে কোথায় নিয়ে গেছে তার খোঁজ কেউ জানে না। তার কবর হয়নি এ বাড়িতে। ওর দাদা-দাদি, বড়ো চাচা, বাবা-মায়ের কবর আছে বাড়ির একদিকে। সময়-সুযোগ মতো কবরে গিয়ে দোয়া পড়ে জয়তুন। ভাত খাওয়া হয় না। মাংস আর আলু খেয়ে ভাতে পানি ঢেলে দেয়। সকালে পান্তা খাবে। শুকনো মরিচ পুড়িয়ে পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা খেতে ওর ভালোই লাগে। মনে হয় বুকের ভেতর শীতল হয়ে গেল। গরম ভাতে এমন অনুভব হয় না। সেটা শুধুই পেট ভরানোর জন্য। হাঁসের মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ার পরও আনন্দ নাই। ওর যত আনন্দ পান্তা ভাতে। শৈশব থেকে এই আনন্দ নিয়ে ওর এতটুকু জীবনে পৌঁছানো। জয়তুন কুপির দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে দৃষ্টি কাউকে খুঁজছে। কিংবা বাইরে থেকে কারো পায়ের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে, যে উঠোন পার হয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছে, সেউতির মা ভাত হয়েছে?
মানুষটার বুকভরা মায়া ছিল। মেজাজ কম ছিল। রাতে খাওয়ার পরে বারান্দায় বসে গান গাইত। কোনো রাতে গান না গেয়ে ঘুমুতে গেছে এমন স্মৃতি জয়তুনের নেই। মনে পড়ে সেউতি হওয়ার সময় তিন দিন ওর ব্যথা ছিল। সে সময় নাকি গান গাইতে পারেনি আবদুল হান্নান। এটা তার কাছ থেকে শোনা কথা। জয়তুন এ কথা শুনে মজা পেয়েছে। একথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকুনি দেয় ও।
শুনতে পায় উঠোনে ছেলেমেয়েদের পায়ের শব্দ। আল আমিন জোরে জোরে বলে, মায়ের এখনো খাওয়া হয়নি?
সেউতির কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ও জিজ্ঞেস করে, তুই কোথায় গিয়েছিলি আমিন?
দূরে না, কাছেই।
কোথায়?
বিড়ি টানতে।
বিড়ি! সেউতি চেঁচিয়ে ওঠে।
আস্তে, মা শুনবে।
তুই, তুই ...
তোতলাস কেন? তুই জানিস না ছেলেদের কথা? আমার বয়সি কামলা ছেলেরা সবাই বিড়ি টানে।
কবে ধরেছিস?
মাস দুয়েক হলো।
কাশি আসে না?
আসে। সেইজন্য বাইরে যাই।
তুই তো বেশ পেকে গেছিস রে আমিন।
হো-হো করে হাসতে হাসতে ও বলে, যাদের বাপ থাকে না তারা আরো তাড়াতাড়ি পাকে।
সেউতি মন খারাপ করে না। ভাবে, ও নিজের মতো করে বড়ো হতে শিখছে, শিখুক। বখে না গেলে হয়।
তুই বখে যাবি না তো আমিন?
না, না খারাপ ছেলে হবো না। মন দিয়ে সবাইকে দেখাশোনা করব।
খোদার কসম, তুই খারাপ কিছু করবি না?
খোদার কসম, এই তোমাকে ছুঁয়ে বললাম, করব না। তুই ভয় পাস না বুবু।
তুই কিছু করলে আমার খুব দুঃখ হবে।
আবার হাসতে হাসতে একছুটে রান্নাঘরে আসে আল আমিন। ফরিদ আর আলতুও রান্নাঘরে এসেছে।
মা আপনার ভাত খেতে এত দেরি হয় কেন?
আমি যে অনেক ভাত খাই।
কয় থালা ভাত খান?
পাঁচ-ছয় থালা।
হি -হি করে হাসে আলতু আর ফরিদ।
আমি কোনোদিন আপনাকে এত ভাত খেতে ...
দেখিসনি তো?
হ্যাঁ, দেখিনি।
আমার সঙ্গে যে জীন পরীও ভাত খায়।
এবার সবাই মিলে হাসে। হাসিতে বাড়ি ভরিয়ে দেয়। জয়তুনের মনে হয়, এদের সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে। আর এই বাড়ির সবখানে আবদুল হান্নান আছে। কবর নাইতো কি হয়েছে, আছে তো!

জয়তুন হাঁড়ি-পাতিল বাসন-কোসন গুছিয়ে একদিনের পাট চুকিয়ে ফেলে। একটা দিনতো গেল, রাতের বাকিটুকু কোনো না কোনোভাবে কাটবে। হয় ঘুমিয়ে, না হয় অর্ধেক রাত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে।

দিন গড়িয়ে ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়।

রোজার মাসের শেষদিকে একদিন দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার সময় আল-আমিন বলে, আমি ঠিক করেছি ঈদের দুই দিন আগে গোস্ত আনতে চরে যাব।

চরে? চরে কেন?

ওখানে ইন্ডিয়ার গরু জবাই হবে। দাম কম পড়বে।

টাকা কোথায় পাবি?

ঈদের দিন মা পোলাও-মাংস রাঁধবে বলে আমি একটু একটু করে টাকা জমিয়েছি। ফুর্তি করব, ফুর্তি।

টাকাগুলো আমাকে দে। আমি তোদের জন্য জামাকাপড় কিনব।

না, তা হবে না। আপনার টাকা দিয়ে আপনি আমার জন্য একটা কালো রঙের হাফ প্যান্ট কিনবেন।

জয়তুন ভুরু কুঁচকান।

কালো না, আমি নীল রঙের হাফ প্যান্ট কিনব।

সেউতি হাসতে হাসতে বলে, তোর গায়ের রং কালা, তুই কালা রং চাস কেন? আমি মাকে বলব তোকে লাল রঙের প্যান্ট কিনে দিতে।

তোরা যদি লাল-নীল প্যান্ট কিনিস সেটা আমি নদীতে ভাসিয়ে দেব।

আচ্ছা, আচ্ছা, তুই যা চাইবি তা হবে। ভাত খা এখন।

আল আমিন গপগপিয়ে ভাত খেয়ে বাইরে চলে যায়। জয়তুন খুশি হয়ে বলে, ছেলেটা আমাদের জন্য ভাবে। সবাইকে মাংস খাওয়াবে বলে, টাকা জমিয়েছি। বেশ করেছে।

তুমি খুব খুশি না মা?

হ্যাঁ রে, খুব খুশি। খুশি হবো না?

ও আব্বার মতো হয়েছে আম্মা। আব্বা ঈদের আগে আমাদের জন্য গোস্ত জোগাড় করতেন।

জয়তুন মাথা নাড়ে।

আপনি পোলাও রান্না করতেন।

হ্যাঁরে, মনে আছে।

আব্বাও কালো রঙের জামা পরতো। যেদিন আব্বা গরু আনতে গেল সেদিনও তার গায়ে ছিল কালো রঙের জামা।

জয়তুন চোখ বড়ো করে তাকায়। মেয়েটা ঠিকই মনে রেখেছে।

আমার জন্য আপনার জামা কিনতে হবে না আম্মা। সেই টাকা দিয়ে আপনি জিলাপি কিনবেন। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের জিলাপি খাওয়াবেন। তাহলে আমি ঈদে বেশি আনন্দ পাব।

তোর জন্য একটা জামা কিনব না মাগো?

না আম্মা, কাজের বাড়ির খালাম্মা বলেছে জামা কিনে দেবে।

জয়তুন বেওয়ার মন খারাপ করে। বুঝতে পারে মেয়েটি বাপের জন্য কাঁদে না। কিন্তু ওর বুকজুড়ে বাপের স্মৃতি নিশ্চুপ নেই। স্মৃতি কথা বলে।

ঈদের কয়দিন আগে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় আল আমিন। জয়তুন সারা গাঁয়ে খুঁজে ওর হদিস করতে পারে না। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে দু'দিন বাদে বাড়ি ফেরে ঘাটের লোক। মুন্সী আল আমিনের নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনে চমকে ওঠে।

বলেন কি? ও ফিরে আসেনি?

জয়তুন ঘাড় নাড়ে।

ওতো আমাকে বলল চরে গোস্ত আনতে যাবে। আমি দেখলাম ও গরুর লেজ ধরে নদীতে নামল। তারপর-কথা বলতে পারে না মুন্সী। জয়তুন শুকনো মুখে বাড়ি ফেরে। গুনগুন করে কাঁদে সেউতি। ঘরে থাকলে কাঁদে, রাস্তায় হাঁটার সময় কাঁদে, অন্যের বাড়িতে কাজের সময় কাঁদে। ওর কান্না দেখে সবাই মন খারাপ করে।

শুধু চোখে পানি নেই জয়তুনের। ও বোবার মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেউতিও সবদিকে তাকায় শুধু ভিজে চোখে। ও বুঝতে পারে পুরো নদীটা ওর চোখে ভর করেছে। বাবার মৃত্যুর পরে নদী ওর মায়ের চোখে ঢুকেছে। ভাই নিখোঁজ হওয়ার পরে ঢুকেছে ওর চোখে। আল আমিনের প্যান্ট খুঁজে দেখেছে। ঘরে ওর পুরনো প্যান্ট দুটো আছে। মায়ের কেনা নতুন কালো প্যান্টটা পরেই ও নদীতে নেমেছে। ও বুকে ঈদের খুশি নিয়ে গেছে। শুধু গোস্ত নিয়ে ফেরেনি। অপেক্ষায় রেখে দিয়েছে বাড়ির সবাইকে।

ঈদের আনন্দ ফুরিয়ে গেছে। আবার দিনের শুরু। অন্যের বাড়ি থেকে দেওয়া নতুন জামাটি পরা হয়নি সেউতির। আল আমিন ফিরলে পরবে এমন আশায় প্রতিদিন নদীর ঘাটে যায় বাড়ির সবাই। আগে নদীর ঘাটে যেত জয়তুন একা। স্বামীর শোকে কাতর হয়ে যেত। এখন যায় বাড়ির সবাই। ফরিদ আর আলতু আগে যেত খেলতে, এখন সবার সঙ্গে চুপ করে বসে থাকে নদীর পাড়ে। কখনো নদীতে গরু ভাসতে দেখলে দৌড়ে ঘাটে গিয়ে দাঁড়ায়।

কাকু ওই নদীর লেজ ধরে কি আমিন ভাই আসবে? সেই তো কবে গোস্ত আনতে গেছে আসে না কেন?

মুন্সী ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলে আলতু বলে, কাকু আমার ভাই মাঠে গরু চরাত। ভাই বলেছে, আমাদেরকে ঈদের দিন গোস্ত খাইয়ে তারপরে নদীতে রাখালের কাজ করবে। নদীতো মাঠ না কাকু। নদীতে কি রাখালের কাজ করা যায়?

মুন্সী ওদের কাছে টেনে বলে, এরপর ঘাটে আসলে ছিপ নিয়ে আসবি। আমার কাছে বসে তোরা মাছ ধরবি।

দুই ভাইবোন হাততালি দিয়ে বলে, কি মজা, কি মজা-কাকু খাবে মাছ ভাজা।

দুজনে লাফাতে লাফাতে আবার ছুটে যায় মায়ের কাছে, বোনের কাছে।

আমাদেরকে একটা বড়শি বানিয়ে দেবে বুবু?

সেউতি মাথা নেড়ে বলে, না।

কেন না? আমরা মাছ ধরব।

মাছ ধরার মতো তোমরা বড়ো হওনি। আম্মা বাড়ি চলেন।

কথা শেষ করেই সেউতি হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে কাঁদে।

প্রায় পনেরো দিন পরে মনোহরপুরে লাশ ভেসে আসে আল আমিনের। দেখে চেনার উপায় নেই। জয়তুন আর সেউতি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ওর কালো রঙের প্যান্টের দিকে। ওকে বোঝার চিহ্ন এটুকুই। অবিশ্বাস্য মনে হয় জীবনের জলরঙ।

সচিত্র বাংলাদেশ এখন

ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

পালিয়ে গেলাম

মাকিদ হায়দার

ঘন ঘন বদলে ফেলি নাম ঠিকানা
কেউ যেন আর
খুঁজে না পায় কোথায় থাকি।
আমার স্বভাব আমিই জানি,
জানতো আরো দুই, চারিজন
তাদের ভয়েই
বদলে ফেলি নাম ঠিকানা।
আমার নিকট
হাজার বিশেক টাকা পেত তাদের দুজন
আজ দিচ্ছি
কাল দিচ্ছি
বলে বলেই, যখন দেখি পারব না আর
কোনোকালেই ফিরিয়ে দিতে, সেদিন রাতেই
পাড়া ছেড়ে পালিয়ে গেলাম
আরেক পাড়ায়।
বাকি দুজন থাকত চেয়ে, কখন কাকে বলব ডেকে
আসুন একা আমার সাথে।
এক মানসির মুখের আদল অনেকটা ঠিক মোনালিসা
আরেক জনের নাম ভুলেছি অনেক আগে; ইচ্ছে করে।
তিনিও পাবেন
হাজার, হাজার।
মিথ্যে বলে হাতিয়ে ছিলেম অর্ধ কোটি।
এখন আমি বন্দি লুব্ধ অর্ধ কোটির
অক্ষিজুড়ে। তিনি আমায় অগ্নিরোষে
না পুড়িয়ে
দেখা হলেই বলেন হেসে
চলো এবার আমার সাথে।

মানুষ ও মানবতা খুঁজি

বাবুল তালুকদার

মানুষ ও মানবতা খুঁজি
শতাব্দী থেকে শতাব্দী
দিনদিন মানুষ অসহায়
মানবতা পালিয়ে যায়
মাটির স্তূপে ঢেকে যায় স্বপ্ন।
আগুনের লেলিহানে জ্বলে পুড়ে ছাই ছাই
আশা-ভালোবাসা তলিয়ে যায় অন্ধকারে
ধ্বংসে যায় জীবন ও যৌবন
দেহ-মন কঙ্কাল হয়ে যায়
চোখে-মুখে কুয়াশার ধোয়া আর ধোয়া
শব্দ নেই, নিস্তব্ধ চুপচাপ নিশ্চুপ
অনাহারে অধ্যাহারে কাটায় লাল বাহাদুর
প্রকৃতির দ্বারে ঘুরে বেড়ায়
ন্যাংটি পাগল
মাঠে ঘাটে রাত যাপন করে
আসমান জমিনে
কেউ কোনোদিন ফিরে তাকায়নি একবারও
লাল বাহাদুর একা শুধু একা।

কবি তোমার জন্যে মালা গাঁথা

মিয়াজান কবীর

নজরুল তুমি প্রেম-দ্রোহের কবি
তুমি সাম্যের কবি
তুমি প্রেয়সীর জন্যে লিখেছ প্রেমের কবিতা
আবার নিপীড়িত মানুষের জন্য
ঘোষণা করেছ বজ্রধ্বনি।
কবি তুমি ছিলে বাঁধন হারা
সাম্যবাদী, সর্বহারা
তুমি বাজিয়েছ অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি
বিদ্রোহী সুরে গেয়েছ ভাঙার গান।
তোমার বুক ভরা ছিল রিক্তের বেদন
চোখের চাতক হয়ে করেছ ব্যথার দান।
তুমি দেখেছ মধুমালা, নতুন চাঁদ, সিন্ধুহিন্দোল
আরো দেখেছ মৃত্যুক্ষুধা, নির্ঝর, সন্ধ্যা, প্রলয়ংকর প্রলয় শিখা।
আলেয়ার আলো হয়ে ঝিলিমিলি তারা ভরা রাতে দিয়েছ পুতুলের বিয়ে।
ভোরের পাখি বুলবুল হয়ে গুলবাগিচায় গেয়েছ মহুয়ার গান
ঘুম জাগানিয়া পাখির গানে জাগিয়ে তুলেছ ঘুমন্ত শিশুকে।
চক্রবাক হয়ে ডেকেছ সাতভাই চম্পা
জাগো চির সুন্দর কিশোর।
পুবের হাওয়া লেগেছিল তোমার বুকে
ফুটেছিল কবিতা কাননে দোলনচাঁপা, ঝিঙে ফুল।
কুহেলিকা ঘেরা দুর্দিনের যাত্রী হয়ে
করেছ তরুণের অভিযান।
চন্দ্রবিন্দু হয়ে উদিত হয়েছ ধূমকেতুর মতো।
তোমার হাতে ছিল জুলফিকার
কণ্ঠে ছিল সুরলিপি, সুরসাথী আর ছায়ানট।
গানের মালায় সুর ব্যঞ্জনায় ভরিয়ে দিয়েছ
সুরমুকুর, গীতি শতদল আর বনগীতি।
গল্পকথায় গেঁথেছ শিউলিমালা,
সংগীতাঞ্জলিতে ভরিয়ে দিয়েছ দেবস্তুতি,
রাঙিয়ে দিয়েছ রাঙাজবা, সন্ধ্যামালতি।
রুদ্রমঙ্গল বাসনায় নবযুগে লাঙল চষে
বজ্রনির্ঘোষ বাণী প্রকাশ করেছ দুরন্ত সাহসিকতায় অসংকোচ চিত্তে
রাজবন্দির জবানবন্দি।
আর যুগবাণী ধারায় নিয়ে এসেছিলে
গণবাণী বিদ্রোহী ঝংকারে আপন সত্তায়।
ফণিমনসা বেশে চিত্তনামা শপথে
ভেঙেছ পরাধীনতার জিঞ্জির।
ফুল ও ফসলে ভরিয়ে দিয়েছ
শেষ সওগাত, সঞ্চিতা, সঞ্চয়ন।
আর কাব্য আমপারা, মরু ভাস্কর
তোমার ছন্দগাঁথায় এক অনবদ্য সৃষ্টি।
কবি তুমি মনের মাধুরিতে এঁকেছ
প্রেম বিরহের বিমূর্ত ছবি।
আপন মনে গেয়েছ মানবতার জয়গান,
তুমি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ছিলে নিমগ্ন।
আপন মহিমায় তুমি ভাস্বর
কবি শুধু তোমার জন্যে কথার মালা গাঁথা।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির শক্তি সাহস প্রেরণা

দেলওয়ার বিন রশিদ

সকালের সোনা রোদ আঙিনায়
বৃক্ষের পত্রগুচ্ছে সবুজ স্নিগ্ধতা
বড়ো অপরূপ,
ফুল ফোটা বাগিচায় প্রজাপতি,
যেন রঙের বৈভব উপচে পড়ছে,
প্রকৃতিজুড়ে মধুর পরিবেশ,
সতেরো মার্চ পিতার জন্মদিন
ফুল ফোটা দিন,
উনিশ শ' বিশ খ্রিষ্টাব্দে সতেরো মার্চ
প্রিয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি সৌরভময় ফুলের নাম,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
দুঃখী মানুষের স্বপ্ন আশার নাম
মুজিব মানে অকুতোভয় মহান বীর, শ্রেষ্ঠ বাঙালি
মৃত্যুকে তুচ্ছ করে
বঞ্চিত বাঙালির স্বপ্ন সাধ পূরণ
তাঁরই উদারতা,
বাংলার আকাশে এই যে উড়ছে সবুজে লাল পতাকা
সেতো তাঁরই মহান কীর্তি।
প্রিয় বাংলাদেশ স্বাধীনতা তাঁরই চিন্তার পূর্ণতা।
সতেরো মার্চ আলো ছড়ায় প্রিয় পিতার মুখচ্ছবি
ওই সবুজে লাল পতাকা জুড়ে দেখি,
প্রিয় পিতার উদারতা
মহত্ব, মহানুভবতা
অনুভবে সারাক্ষণ,
বাঙালির হৃদয়ে পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সারা সময় সারাক্ষণ
পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাঙালির শক্তি সাহস প্রেরণা, সুখ ঐশ্বর্য বৈভব।

সু স্বাগতম

ইফফাত রেজা

শব্দেরা এগিয়ে যায়
যা বলেছে
হৃদয় বেজেছে
ঘড়ি এগিয়েছে
সময় সময়ে হারিয়েছে
কত দিন
কত পথে
কত কথা
ছুঁয়েছে কে কার
কিছু প্রাণে বাজে
বারে বারে প্রতিক্ষণে জন্ম নেওয়া প্রাণ
ফোঁটায় ফোঁটায়
পতিত পাতায় মিশে যায়
নয়া জীবনের অতীত নিশ্বাস।

মুখোমুখি তিতাস

লিলি হক

মুখোমুখি তিতাস আমার প্রাণের তিতাস
ঢেউ খেলানো মনের বাউরী বাতাস
পরম মমতায় একজন কবিকে, বুকে
টেনে নিয়েছিল মধ্য দুপুরে।
যেখানে রয়েছে নদীর কলতান
প্রেমিকের বিরহী মান অভিমান,
হয়তবা লেখা হবে গল্প-কবিতা
গান সুর দিলে পাবে প্রাণ।
তিতাসের জলে সাক্ষী থাকুক
ভালোবাসা আছে থাকবে কইবে
কথা অফুরান, হৃদয় দিয়ে অনুভব
চোখে চোখ প্রচণ্ড বিশ্বাস রিকশা চালক
শুধাই তারে নাম বলল, আকাশ।
মনে রেখ প্রিয়তম তিতাস
আমি এসেছিলাম, অন্তরে অন্তরে
লেখা রবে তোমার নাম।
মনে রেখ প্রিয় মুখ প্রিয় মানুষ
প্রিয় নদী কখনো কোন স্বজন
কালভৈরবীর ঘণ্টাধ্বনি শুনতে
শুনতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঐতিহ্য
সংস্কৃতিকে জানতে এখানে এসছিল।

বিরহ ফাগুন

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

শীতের মতন চলে গেলেও
এতটা রিক্ত-নিঃস্ব করে তো আর যাওনি!
রেখে গেছ কিছু স্মৃতি, বেদনা, নিঃসঙ্গতা
কবিতা লিখার উপাদান।
তোমার বসন্ত দিনে রচি তাই বিরহ ফাগুন
শিমুলতলায় বসে গাই বিচ্ছেদের গান।

স্বদেশ

মো. রিয়াজুল ইসলাম

গর্জে ওঠ বাংলা ফাঁড়িয়া
বিশ্বের নিশানা সব ছাড়িয়া,
বক্ষে কুণ্ড ক্রোধে বীর
এ ভিটা মোর শুধু মাতৃর।
মোরা বীর, বারুদের দানা বিষাক্ত তীর
মোদের ক্রোধে ঝরবে বজ্র দারা,
উন্মাদ প্রহরী নিদ্রাহারা
মোরা শক্তির স্তূপ, উড়ন্ত গাঙচিল।
মোরা দুরন্ত দুর্বার
ধরে আঁকড়ে মাটি, শত্রুকে করি চূড়মার,
মোরা বিবেকের আত্মার অমর শির
কঠোর শ্রমে গড়া পল্লির নীড়।
মোরা দরদ কণ্ঠে পাঠ করিব
আত্মার জরানো সেই গান,
অসিম সাহসে ভরা হউক
বাংলা অম্লান।

ও পাশে প্রহর ব্যস্ত

শাহনাজ

আটকে গেছি এ পাশে
বদ্ধ দরজায়
ও পাশে প্রহর ব্যস্ত
গাড়ির হর্ণ ব্যস্ত পদ সঞ্চালন
এ পাশে দেয়ালের সাথে ঘুমিয়ে
ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে একই জায়গা,
কতটুকু ফাঁক– কতটা বিচ্ছেদ
কতটা দূরত্বে থাকে মনের চাইতে দূরে
শরীরের চাইতেও
হৃদয়ের শব্দ বড়ো।

বিদ্রোহী নজরুল এবং

শিল্পী ভদ্র

মাজাহেদার কোলজুড়ে নজরুল এলেও,
তাঁর নবজন্ম হয়েছিল কালের গর্ভাশয়ে।
যে কালসিংহের গর্জন শিখিয়েছে তাঁকে
শিখিয়েছে আপোশহীন হাতে ঈপ্সিত লক্ষ্যে যেতে।
তাঁর নবজন্ম হয়েছিল প্রকৃতির কোলে,
যে মাতাকে শিক্ষা দিয়েছে সাম্যবাদীমন্ত্রে
নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র,
ভেদাভেদ ভুলে মানুষকেই সত্য জানতে।
তার জ্ঞানার্জন হয়েছিল বিশ্বপাঠাগার থেকে
লেটো, কবিগান, গজল, শ্যামাসংগীত, ইসলামি গানে।
খ্যাতনামা হয়েছিল কোনো অজানা গভীর সাধনে।
দারিদ্র্য তাঁকে শিখিয়েছে আপোশহীন হতে।
মক্তবে ইমামতি, খানসামা, রুটির দোকানের কাজে,
বাজি জিতেছেন তিনি সবখানেই।
সংগ্রামী নজরুলের জন্ম হয়েছিল দেশের পরাধীনতা দেখে,
শৃঙ্খলমুক্ত করতে শিশুকালেই বিদ্রোহী হয়েছিল সে।
দেশকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করার অদম্য শপথে,
'প্রথম বিশ্বযুদ্ধে' গিয়েছিল সে সৈনিক হয়ে।
নজরুলের নবজন্ম হয়েছিল লেখনীর আখরে,
যার প্রজ্বলিত ভাষায় দেশের প্রাণশক্তিকে,
আঘাতে জাগিয়েছিল কমান্ডার হয়ে।
কৃষক, শ্রমিক, মজুর, নারী,
সবপ্রাণে– প্রাণ জাগালো তাঁর ক্ষুরধার বাণী।
চাবুক কশালেন ভাষা-অস্ত্রে,
আধমরাদের ঘা-মেরে জাগাতে।
জাগালেন তিনি ঘুমন্ত জাতির প্রাণশক্তিকে।
নজরুলের নবজন্ম হলো সাংবাদিকতা পেশাতে,
ব্রিটিশ শাসকের পিলে চমকালো তাঁর 'সম্পাদকীয়' লেখাতে।
জন্ম হলো তাঁর নূতন করে কারাগারে,
'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানে
শৃঙ্খল ভাঙার উদ্দাম গতিময়বানে।
প্রবন্ধ-গান-কবিতা-নাটকের প্রদীপ্ত ভাষাতে,
জ্বেলে দিল সে স্বাধীনতার মন্ত্র, জাতির প্রাণে।
পেছনে ফেলে সব উপমা,
বীর নজরুলের বিদ্রোহীসত্তা,
কালজয়ী করেছে তাঁকে–
দিয়ে 'বিদ্রোহী কবি'র আখ্যা।

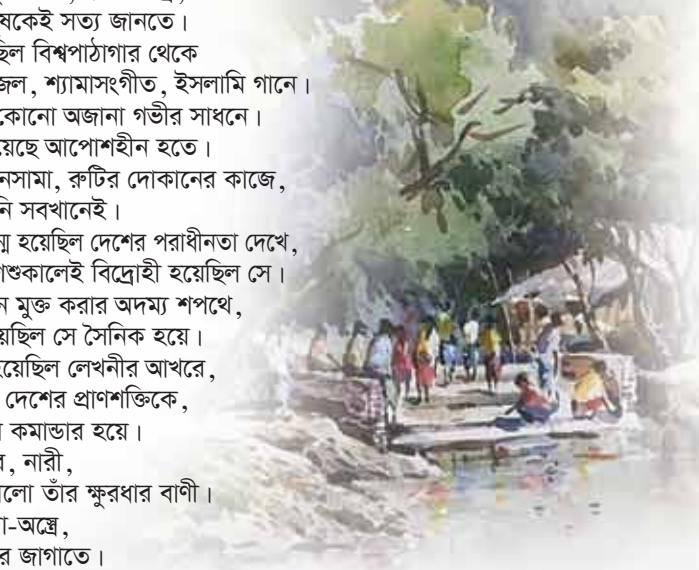

প্রিয় কবি নজরুল

জাকির হাসান

প্রিয় কবি কাজী নজরুল
তাঁর কবিতায় ঘাত-প্রতিঘাত
আছে ভালোবাসা।
আছে স্বপ্ন দোলা স্পন্দন
অসাম্প্রদায়িক অটুট বন্ধন
জাগে বাঁচার আশা।
আছে শক্তি আছে ভক্তি
আছে মুক্তি আছে যুক্তি
আছে জ্ঞানের আলো
তাঁর সাহিত্য কোটি প্রাণে
ছড়িয়ে আছে বিশ্বমানে
সেই জ্ঞানের আলোর প্রদীপ
জ্বালো সবাই জ্বালো।

পদাবলির গান

মিলি হক

প্রভাতে একদিন আড্ডা জমেছিল
বনপলাশীর পদাবলি শোনাবে,
গেয়ে গেল গান জমানো আঁখিতে
সুরের বাঁধন বেঁধেছিল।
আকাশ ভুবনজুড়ে সুউচ্চ গাছ
পলাশ ছিল না গঞ্জে, ছিল না মঞ্চে
শুধু ঝরা পাতা আর ঝরা পাতা নিঝুম
দূরে দাঁড়িয়ে মহুয়া কুসুম
অব্যক্ত বেদনায় কেঁদেছিল।
বুকে তার স্বপ্নখানি
পদাবলির বাণী সুর ও কাহিনি
হয়ত পেয়েছিল হয়ত পায়নি
মহুয়া বুঝেছিল তুমি বোঝনি।
ছুঁয়ে দিতে হৃদয়ের উষ্ণতা চাই
বনপলাশীর গান বিঁধেছিল
মহুয়ার বনে মহুয়ার মনে
বিঁধেছিল তীর তোমারও হৃদয়।
শুধু হাত পেতে উষ্ণতাটুকু নিতে
শেখনি, শেখনি কোনো পদাবলির গান।

শিশু আশা

সাদিয়া সিমরান

ভালোবাসা নয় কেন শিশু
হও তুমি টুপ টুপ শিশু আশা
ভালোবাসা টেনে নেয় শিশু কথা
শিশু আশা শিশু আশা
ওদের জীবন
একাধারে নিষ্পাপ প্রবীণ
প্রতিটি সভ্যতা সহজ হয় নতুন স্বরে
ফিরে ফিরে গড়ে।

বঙ্গভবনে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ আয়োজিত ৯ই এপ্রিল ক্যাপস্টোন কোর্স ২০১৯-এর প্রতিনিধিদলের মাঝে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের উন্নয়নে আরো অবদান রাখার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ দেশের উন্নয়নে আরো অবদান রাখার জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ আয়োজিত ক্যাপস্টোন কোর্স ২০১৯-এর সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। ৯ই এপ্রিল ২০১৯ বঙ্গভবনে একটি প্রতিনিধিদল সৌজন্য সাক্ষাত করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, এই কোর্স সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানা মতের ভিন্নতার অবসানে সহায়ক হবে। তাছাড়া এটি নীতি প্রণয়ন ও নীতি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। এই কোর্স থেকে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা অংশগ্রহণকারীরা জনগণকে আরো সেবাদানের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে এবং দেশের টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি তরান্বিত করবে বলেও রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন।

স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের জন্য আরো সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। ১৬ই এপ্রিল 'জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা সপ্তাহ-২০১৯' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ কথা উল্লেখ করেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সারাদেশের হাসপাতালগুলোর শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিসহ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য সাপোর্টিং স্টাফ। মেডিক্যাল শিক্ষার প্রসারে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হচ্ছে। বর্তমানে সারাদেশে প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টিসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এলক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবার প্রথমবারের মতো 'জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা সপ্তাহ' পালিত হয়। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত স্বাস্থ্যসেবা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য ছিল– 'স্বাস্থ্যসেবা অধিকার, শেখ হাসিনার অঙ্গীকার'।

ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্রগুলো বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৮ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ) ২০১৯-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, দেশের ঐতিহ্যবাহী পর্যটনকেন্দ্রগুলো বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে। ১৮ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী (১৯-২১শে এপ্রিল) নবম বাংলাদেশ ট্রাভেল ও ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ)-২০১৯ মেলার উদ্‌বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন ও আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানগুলো বিদেশিদের কাছে তুলে ধরতে বেসামরিক বিমান পরিবহণ, পর্যটন মন্ত্রণালয় ও গণমাধ্যমের প্রতিও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিদেশি পর্যটকরা আমাদের অতিথি। তারা যাতে নির্বিঘ্নে এবং আনন্দঘন পরিবেশে বাংলাদেশ ভ্রমণ করতে পারেন এবং বাঙালি আতিথেয়তায় মুগ্ধ হন, তাও নিশ্চিত করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুয়াকাটা, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, হিমছড়ি, সিলেট চা বাগান, ময়নামতি, বগুড়ার মহাস্থানগড়সহ বাংলাদেশে যতগুলো পর্যটন কেন্দ্র আছে সেগুলোকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। এছাড়া আরো সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্র সৃষ্টি করতে হবে যাতে পৃথিবীর ভ্রমণপিপাসু মানুষ একবার বাংলাদেশে আসলে যেন বারবার আসতে চায়।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে মার্চ 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯' উপলক্ষে তেজগাঁওয়ের জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সম্মিলিত সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং সমরাস্ত্র পরিদর্শন করেন। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা, বর্তমান সরকারের বিগত ১০ বছরের সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়ন, দেশ ও জাতি গঠনে সশস্ত্রবাহিনীর ভূমিকা এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্রবাহিনীর অবদান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর নির্মিত চারটি পৃথক স্টল পরিদর্শন করেন।

স্বাধীনতা পদক প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্বাধীনতা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার সুফলটা যেন বাংলার জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছায়, সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নত করা যায়, কিভাবে উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বে যেন একটা মর্যাদা ফিরে পাওয়া যায়– সেলক্ষ্যে তাঁর সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তিনি দেশের ১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে গৌরবময় ও অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীনতা পদক প্রদান করেন।

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক থেকে শিশুদের রক্ষা করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ঢাকা জেলা প্রশাসন-এর আয়োজনে শিশু-কিশোর সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার। তারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি শিশু-কিশোরদের উন্নয়নে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তাঁর সরকার সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, যেখানে শিশুরা সুন্দর, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারবে। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এলক্ষ্যে তিনি শিশু-কিশোর, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ সবাইকে এর কুফল সম্পর্কে জানাতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। শিশু-কিশোরদের মেধা ও মনন গঠনে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, শরীর চর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সারা দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিশু-কিশোরদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ডিসপ্লে উপভোগ করেন এবং দেশব্যাপী স্কুল পর্যায়ে অনুষ্ঠিত শুদ্ধ সুরে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নিরপরাধ মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে মার্চ কুর্মিটোলায় র‍্যাব সদর দপ্তরে র‍্যাবের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় র‍্যাবের প্রতিটি সদস্যের দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন এবং সফলতার কথা তুলে ধরেন। কোনো নিরপরাধ মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হন সেদিকে লক্ষ রাখতে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি অন্যায়কারী যে-ই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া আইন প্রয়োগের সময় মানবাধিকার বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখেই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নীতি অবলম্বন করার কথা উল্লেখ করেন।

শিল্পের বহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিল্পের বহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং দেশে-বিদেশে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে মার্চ ২০১৯ ঢাকার কুর্মিটোলায় র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তরে প্রতিষ্ঠানটির ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে কেক কেটে উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

বাজার সৃষ্টির জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। ৩১শে মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী 'জাতীয় শিল্প মেলা ২০১৯' উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। তিনি দেশের জনগণকে মেধাবী বলে আখ্যায়িত করেন এবং ডিজিটাল ডিভাইস তৈরি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে এ মেধাকে কাজে লাগাতে পরামর্শ দেন। তিনি তৃণমূল পর্যায়ে সব নাগরিক সুবিধা প্রদান করে প্রতিটি গ্রামকে একটি শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠায় তাঁর সরকারের পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মর্যাদা ধরে রেখে দেশকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে উল্লেখ করেন।

অগ্নি নিরাপত্তায় ১৫ নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা এপ্রিল সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ভবনে অগ্নি দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে অগ্নি নিরাপত্তায় সংশ্লিষ্টদের ১৫টি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই এপ্রিল 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে সার্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি এ খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে বৈশ্বিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। একই সাথে জনসাধারণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিতদের দায়িত্ববোধ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনার আহ্বান

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে স্বর্ণযুগ আনার জন্য সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে দূরদৃষ্টি নিয়ে ঢাকায় চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়াপত্তন করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই চলচ্চিত্রের বিকাশে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সারাবিশ্বে সমাদৃত হবে। ৩রা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)-তে আয়োজিত দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্‌বোধন সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি। জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদ্‌যাপন কমিটি ২০১৯-এর আহ্বায়ক সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে তথ্যসচিব আবদুল মালেক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এর আগে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শান্তির পায়রা ও একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ৫ই এপ্রিল শিল্পকলা একাডেমিতে তিন দিনব্যাপী ২য় জাতীয় গণসংগীত উৎসবের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

গণসংগীত জাতির প্রেরণা

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, গণসংগীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপুল প্রেরণা যুগিয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ এখন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পথে চলছে। নতুন নতুন গণসংগীত এখন জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত, মানুষের মূল্যবোধকে উজ্জীবিত এবং দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগে ব্রতী করবে। ৫ই এপ্রিল রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় জাতীয় গণসংগীত উৎসবের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

সাফল্য অর্জনে প্রয়োজন স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, জীবন একটি সংগ্রাম ও যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধ-সংগ্রামের এই জীবনে স্বপ্নের সাথে প্রচেষ্টা যুক্ত করেই অর্জিত হয় সাফল্য। স্বপ্নের সাথে প্রচেষ্টা যুক্ত হলেই সম্ভব স্বপ্নের ঠিকানা অতিক্রম করা, অসম্ভবকে সম্ভব করা। বাংলাদেশের যুব সমাজ যেমন স্বপ্ন দেখবে, তেমনি তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকলেই অর্জন করবে সেরা সাফল্য। ৭ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত যুব সম্মেলন ২০১৯ উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা উল্লেখ করেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী পরিচালনায় আজ অর্থনৈতিকভাবে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথম পাঁচটি দেশের অন্যতম। বাংলাদেশ এক সময় বন্যা-জলোচ্ছ্বাসের জন্য বিদেশে পত্রিকার শিরোনাম হতো। আজ বাংলাদেশ বিশ্বের পত্রপত্রিকায় শিরোনাম হয় যখন জাতিসংঘের মহাসচিব, বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অথবা মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের বিস্ময়কর উন্নয়নের প্রশংসা করেন। বাংলাদেশ শিরোনাম হয় যখন এদেশের যুবক নদীর মধ্যে জাল পুঁতে মাছ চাষের অনন্য উদাহরণ তৈরি করে।

ড. হাছান মাহমুদ আরো বলেন, এক সময়ের খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ আজ খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত, বিশ্বে সবজি ও মাছ উৎপাদনে ৪র্থ, আলু উৎপাদনে ৭ম। দেশের বিশাল যুব সমাজ বাংলাদেশকে আরো দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মানব সেবার মতো মহৎ কাজ আর নেই

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বহু বছর ধরে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে লায়ন্স ক্লাব। এটি আরো প্রসারিত করতে হবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে মানব সেবায় নিয়োজিত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে মানব সেবার মতো মহৎ কাজ আর নেই। ১২ই এপ্রিল চট্টগ্রাম নেভী কনভেনশন সেন্টারে লায়ন্স ক্লাব আয়োজিত ২২তম আন্তর্জাতিক জেলা কনভেনশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি তাত্ত্বিক উন্নয়ন প্রয়োজন। মেধার সাথে মূল্যবোধ ও দেশাত্মবোধ থাকতে হবে। তাহলে আমরা উন্নত দেশ গঠনের পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠন করতে পারব। বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবহারে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১০ই এপ্রিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ ও গবেষণা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে ফেলোশিপ ও অনুদান প্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক

১লা এপ্রিল: সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৯-এর খসড়া ও গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইনের খসড়া নীতিগত অনুমোদন লাভ করে

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু

দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা একযোগে শুরু হয়

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

২রা এপ্রিল: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবহার অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তির অধিকার

অটিজম সচেতনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

দ্বাদশ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এই অবহেলিত জনগোষ্ঠী যেন আর অবহেলার শিকার না হয়। তারা যেন সমাজে তাদের যোগ্য স্থান পায়। তারা আমাদের সন্তান, আমাদেরই ভাইবোন। সে কথাটা মনে করে সবাই অটিস্টিক বা প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে নিয়ে চলবেন, সেটাই আমি চাচ্ছি

বিশ্ব চলচ্চিত্র দিবস

৩রা এপ্রিল: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব চলচ্চিত্র দিবস'। এ দিবস উপলক্ষে বিএফডিসি মিলনায়তনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ

বিজিএমইএ কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্তরায় বিজিএমই-এর নতুন ভবন উদ্‌বোধন করেন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে। এদিন প্রধানমন্ত্রী ৬৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন

জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ অনুষ্ঠিত

৬ই এপ্রিল: 'জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ' শুরু হয়ে চলে ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত। এই কর্মসূচির আওতায় দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫ থেকে ১১ বছর বয়সি এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সি সব শিশুকে একডোজ করে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো হয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই এপ্রিল ২০১৯ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন–পিআইডি

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত

৭ই এপ্রিল: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সমতা ও সংহতি নির্ভর সর্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা'

একনেকে ৭ প্রকল্প অনুমোদন

৯ই এপ্রিল: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ১৮ হাজার ১৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে

প্রধানমন্ত্রীর ফেলোশিপ প্রদান

১০ই এপ্রিল: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং বিশেষ গবেষণা অনুদানের চেক প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্ব পানি দিবস

১১ই এপ্রিল: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনে পালিত হয় 'বিশ্ব পানি দিবস'। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বের বহু দেশে পানির অভাব থাকলেও নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানির কোনো অভাব নেই। তাই এই প্রাকৃতিক সম্পদটিকে ভবিষ্যতে রফতানিযোগ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি-না সে বিষয়ে এখন থেকে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান

বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৯ ঘণ্টার সম্প্রচার উদ্‌বোধন

১৩ই এপ্রিল: বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচার ৬ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ৯ ঘণ্টা করার উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

শেখ হাসিনা–লোটে শেরিং বৈঠক

বাংলাদেশ ও ভুটান বেশ কিছু পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে ঐক্যমত প্রকাশ করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুই দেশের সরকার প্রধানের বৈঠকের পর সমঝোতার পাঁচটি দলিলে স্বাক্ষর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে এবং সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ডা. লোটে শেরিং ভুটানের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন

বর্ণিল আয়োজনে নববর্ষ উদ্‌যাপন

১৪ই এপ্রিল: শুভবোধ জাগরণের আহ্বানে সারাদেশে উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ বরণ করে নেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা সপ্তাহ উদ্‌যাপিত

১৬ই এপ্রিল: প্রথমবারের মতো সারাদেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয় 'জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা সপ্তাহ'। সপ্তাহটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'স্বাস্থ্যসেবা অধিকার শেখ হাসিনার অঙ্গীকার'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি সপ্তাহের উদ্‌বোধন করেন

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত

১৭ই এপ্রিল: নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সারাদেশে ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস' পালিত হয়

পবিত্র শবেবরাত পালিত

২১শে এপ্রিল: যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী পালিত হয় পবিত্র শবেবরাত

প্রধানমন্ত্রীর ব্রুনাই সফর

২১শে এপ্রিল: ব্রুনাইয়ের সুলতানের আমন্ত্রণে তিন দিনের সরকারি সফরে বন্দর সেরি বেগওয়ানে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২২শে এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী ও সুলতানের উপস্থিতিতে কৃষি, মৎস, পশুসম্পদ, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং এলএনজি সরবরাহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ ও ব্রুনাইয়ের মধ্যে সাতটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০১৯

২৩-২৯শে এপ্রিল: প্রতি বছরের ন্যায় এবারো ২৩-২৯শে এপ্রিল দেশব্যাপী 'জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয়। পুষ্টি সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'খাদ্যের কথা ভাবলে, পুষ্টির কথাও ভাবুন'

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় পরিচয়পত্রে মিলবে ট্রেনের টিকিট

বাংলাদেশ রেলওয়ের টিকিট ক্রয়-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ১২টি ট্রেনের টিকিট কাটতে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা জন্মনিবন্ধন নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৫ই এপ্রিল থেকে ৭৬৯/৭৭০ নং ধূমকেতু এক্সপ্রেস, ৭৫৩/৭৫৪ নং সিল্কসিটি এক্সপ্রেস, ৭২৫/৭২৬ নং সুন্দরবন এক্সপ্রেস, ৭০৫/৭০৬ নং একতা এক্সপ্রেস, ৭৬৫/৭৬৬ নং নীলসাগর এক্সপ্রেস, ৭৭১/৭৭২ নং রংপুর এক্সপ্রেস,৭৪৭/৭৪৮ নং সীমান্ত এক্সপ্রেস, ৭৩৯/৭৪০ নং উপবন এক্সপ্রেস, ৭২৩/৭২৪ নং উদয়ন এক্সপ্রেস, ৭৭৭/৭৭৮ নং হাওর এক্সপ্রেস, ৭০৭/৭০৮ নং তিস্তা এক্সপ্রেস, ৭৩৫/৭৩৬ নং অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোতে ভ্রমণইচ্ছুক যাত্রীদের টিকিট ক্রয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রেলওয়ের ওয়েবসাইট, ই-টিকেটিং ওয়েবসাইট, রেলওয়ের মোবাইল অ্যাপস ও স্টেশন কাউন্টারে এনআইডি/জন্মনিবন্ধনসহ নাম রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। ট্রেন ভ্রমণের ক্ষেত্রে মূল টিকিট প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। টিকিটের কোনো ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না। ই-টিকিটের ক্ষেত্রে নিজস্ব আইডিতে সংগৃহীত টিকিটের প্রিন্ট কপি ও ফটো আইডি প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক। অন্যজনের আইডিতে ক্রয়কৃত টিকিটের ক্ষেত্রে ট্রেন ছাড়ার পূর্বে স্টেশন থেকে মূল টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই মোবাইল ফোনে এসএমএস প্রদর্শন করে ট্রেনে ভ্রমণ করা যাবে না। প্রাথমিকভাবে দুটি ট্রেনে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পরে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়ার ফলে সাতটি ট্রেনে এ সেবা চালু করা হয়। এখন ১৬টি ট্রেনে ন্যাশনাল আইডি ছাড়া কাউকে টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। আগামীতে বাকি ট্রেনগুলোতেও ন্যাশনাল আইডি কার্ড ব্যবহার করে টিকিট ক্রয়ের ব্যবস্থা চালু করা হবে। আশা করা যায় ঈদের আগেই এ ব্যবস্থা চালু হবে। সম্প্রতি রেলের সেবা বিষয়ক এক বৈঠক শেষে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন এসব বিষয় জানিয়েছিলেন।

মাছ ও মুরগির খাবার তৈরিতে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা

২রা এপ্রিল ট্যানারির বর্জ্য ব্যবহার করে মুরগি ও মাছের খাবার তৈরির কারখানার কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। একইসঙ্গে এসব খাবার তৈরির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আদালতে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। এক রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার এই আদেশ দেন।

রেলপথ মন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন ২৪শে মার্চ ২০১৯ রেলভবনের সম্মেলনকক্ষে টিকেট ব্যবস্থায় একই অ্যাপসে সকল সেবা প্রদান বিষয়ক সভায় বক্তৃতা করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

২৫শে মার্চ একটি জাতীয় দৈনিকে 'আদালতের রায় উপেক্ষা; ট্যানারির বিষাক্ত বর্জ্যে মাছ ও মুরগির খাদ্য তৈরি থেমে নেই' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্যানারির বিষাক্ত বর্জ্য দিয়ে মাছ ও মুরগির খাবার তৈরির কারখানা বন্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় রয়েছে। কিন্তু ওই রায়ের তোয়াক্কা না করে অসাধু চক্র প্রকাশ্যে ট্যানারির বর্জ্য দিয়ে পোলট্রি ও ফিশ ফিড তৈরি করছে। এসব খাবার মাছ ও মুরগির মাধ্যমে ক্রোমিয়ামসহ ট্যানারির বিষাক্ত বিভিন্ন কেমিক্যাল মানব শরীরে প্রবেশ করছে। ফলে ক্যান্সার, কিডনি ও লিভারের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্টে আবেদন করেন আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। আবেদনের পক্ষে তিনি নিজেই শুনানি করেন। শুনানি শেষে হাইকোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ ও রুল জারি করে।

লিঙ্গ পরিচয় ছকে যোগ হচ্ছে হিজড়া

হিজড়াদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির চার বছর পর ভোটার তালিকায় 'লিঙ্গ পরিচয়ে' তা অন্তর্ভুক্ত করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এজন্য ভোটার তালিকা আইন-২০০৯ ও ভোটার তালিকা বিধিমালা ২০১২-এ সংশোধনী আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাংবিধানিক সংস্থাটি। সেক্ষেত্রে আগামী হালনাগাদেই 'নারী' ও 'পুরুষের' বাইরে 'হিজড়া' পরিচয়ে ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন তারা। ভোটারদের তথ্য সংগ্রহে নিবন্ধন ফরমের ১৭ নম্বর ক্রমিকে 'লিঙ্গ পরিচয়' ছকে এ 'হিজড়া' যোগ করা হবে। বর্তমানে ১০ কোটিরও বেশি ভোটার রয়েছে। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ণের শুরু থেকে যোগ্যদের জাতীয় পরিচয়পত্রও দেওয়া হয়। এসময় হিজড়ারা ভোটার হয়ে এলেও তারা নারী বা পুরুষ ঐচ্ছিক পরিচয়ে ভোটার হতেন। ২০১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে হিজড়াদের 'লিঙ্গ পরিচয়কে' রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে এ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদন করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের ভোটার নিবন্ধন বিধিমালা প্রণয়নের সময়ই নির্বাচন কমিশন 'হিজড়া'র অপশন প্রস্তাবিত নিবন্ধন ফরমে যুক্ত করে। কিন্তু ভোটার তালিকা আইন ও ভোটার তালিকা বিধিমালা সংশোধন না হওয়ায় তা কার্যকর হচ্ছিল না। ইসি বিষয়টি আইন-বিধি সংশোধনের বিষয়ে কমিশন সভায় উপস্থাপন করে এবং কমিশনের নীতিগত সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। পরবর্তী প্রক্রিয়া শেষ হলেই আগামীতে তথ্য সংগ্রহের সময়ই হিজড়া পরিচয়ে তারা ভোটার হতে পারবেন।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের সফলতার কথা তুলে ধরে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সফলতাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মডেল হিসেবে তুলে ধরেছে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ। স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত, দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, বাজেটের আকার বাড়ানো, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, দশ মেগা প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নেওয়া, রেমিটেন্স রিজার্ভ শক্তিশালী হওয়া, তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসব সফলতার গল্প ওঠে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে ৮ থেকে ১৫ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বসন্তকালীন সভা। সদস্যভুক্ত ১৮৯ দেশের প্রতিনিধিরা এ সভায় অংশগ্রহণ করে। ওই সভায় বাংলাদেশের সফলতার গল্প তুলে ধরে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। বিশেষ করে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমিয়ে আনা, নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন এবং গড় আয়ু বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলোও সভায় তুলে ধরা হয়। দাতা সংস্থা দুটির মতে, বাংলাদেশের উন্নয়ন বিশ্বের রোল মডেল।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নে কাজ করবে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা-আইএমএফ। সংস্থাটি তাদের নিজস্ব টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। এছাড়া অবকাঠামো উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএফসি বছরে গড়ে সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে শেষ হওয়া বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এছাড়া সভায় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিকমানের করে গড়ে তুলতে বিশ্বব্যাংক বড়ো অঙ্কের অর্থ সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এলক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক পাঠদানে বিদ্যালয়গুলোতে আলাদা শ্রেণিকক্ষ গড়ে তোলা হবে। সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হবে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায়। এজন্য সর্বক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেছে বিশ্বব্যাংক।

ব্রুনাই সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে এপ্রিল ২০১৯ সে দেশের সুলতান Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah-এর সাথে তাঁর সরকারি বাসভবন ইস্তানা নুরুল ইমানে সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

বাংলাদেশ-ব্রুনাই সাত চুক্তি সই

বাংলাদেশ ও ব্রুনাই ২২শে এপ্রিল কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ, সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং এলএনজি সরবরাহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার জন্য সাত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ব্রুনাইয়ের সরকারি বাসভবন ইস্তানা নূরুল ইমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ব্রুনাইয়ের সুলতান হাজী হাসান আল বলকিয়ার মধ্যে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর এই চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে ছয়টি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) এবং একটি বিনিময় নোট।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার পেল বাংলাদেশ

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক 'ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার-২০১৯' (দ্য সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি) থেকে ১টি উইনার এবং ৮টি চ্যাম্পিয়নশিপ পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশ। এ খাতে বিশেষ অবদান রাখায় বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কার পেল বাংলাদেশ।

৯ই এপ্রিল সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সংক্রান্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। ডব্লিউএসআইএস-এর কো-চেয়ারম্যান এবং আইটিইউ-এর মহাসচিব হাউলিন ঝাউয়ের কাছ থেকে উইনার পুরস্কার গ্রহণ করেন এবারের ডব্লিউএসআইএস ফোরামের চেয়ারম্যান বাংলাদেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এবং তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

শুদ্ধ উচ্চারণ পারলেই বিপিও'তে কাজ বিপিও সামিটের সমাপনীতে মোস্তাফা জব্বার

শুদ্ধভাবে বাংলা বা ইংরেজি উচ্চারণ করতে পারলেই বিজনেস প্রসেস আউটসোর্স বা বিপিও খাতে কাজ করা যাবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। একইসঙ্গে মন্ত্রী জানিয়েছেন, বিপিও খাতে মিলিয়ন সংখ্যক তরুণের কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। ২২শে এপ্রিল রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে চলমান দুদিনব্যাপী বিপিও সামিট ২০১৯-এর শেষদিনের সেমিনারে এ কথা জানান মোস্তাফা জব্বার।

'আউটসোর্সিং টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসেস' শীর্ষক এই সেমিনারে মন্ত্রী বলেন, বিপিও খাতে কাজ করতে হলে পিএইচডি বা মাস্টার্স ডিগ্রিধারী হওয়া লাগে না। শুদ্ধভাবে বাংলা বা ইংরেজি বলতে পারলেই বিপিওতে কাজ করা যায়। আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া শুদ্ধভাবে কথা বলতে পারে এমন লোকদের এই খাতে অনেক চাহিদা রয়েছে। অন্তত এক থেকে দুই মিলিয়ন তরুণের কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব এই খাতে।

মন্ত্রী আরো বলেন, দেশের সব প্রান্তে একই রেটে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে চাই আমরা। সামনে এমন দিন আসছে, যখন দুর্গম এলাকায় কেউ ঘরে বসেই বিপিও'র কাজ করতে পারবে। এজন্য

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিপিও সামিটের উদ্‌বোধন করেন

আমরা দেশব্যাপী ফাইবার অপটিক্স নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পাশাপাশি ফাইভ-জি নিয়ে কাজ করছি। ২১শে এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিপিও সামিটের উদ্‌বোধন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, আমরা অনুকরণ করব না, আমরা উদ্ভাবন করব– বিপিও ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য এই হোক আমাদের মূলমন্ত্র। তিনি বলেন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার ক্ষেত্রে আইসিটি সেক্টরে তরুণদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে সরকার।

গ্লোবাল এন্টারপ্রেইনিয়রশিপ কংগ্রেস ২০১৯-এর অধিবেশনে তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিমন্ত্রী

আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্মিলিতভাবে কাজ করার তাগিদ দিয়েছেন তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এজন্য উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহকে একত্রে কাজ করার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। ১৫ই এপ্রিল বাহরাইনের রাজধানী মানামায় অনুষ্ঠিত 'গ্লোবাল এন্টারপ্রেইনিয়রশিপ কংগ্রেস ২০১৯'-এর 'স্টার্টআপ নেশনস মিনিস্ট্রিয়াল' শীর্ষক এক অধিবেশনে তিনি এ আহ্বান জানান।

পলিসি সেশন আলোচনায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী উদ্ভাবন পরিকল্পনা, উদ্যোক্তা একাডেমি প্রতিষ্ঠা, হাইটেক পার্ক প্রকল্প ও ইনোভেশন সেন্টার প্রকল্প স্থাপন, আইটি প্রশিক্ষণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তরুণ প্রজন্মের সক্ষমতা অর্জন এবং তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন ও বিকাশে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অর্জন কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুতগতির ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করেছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প-২০২১' ঘোষণা করেছেন। এই রূপকল্প বাস্তবায়নে চারটি মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার। ডিজিটাল বাংলাদেশের সেই চারটি স্তম্ভ হলো– মানবসম্পদ উন্নয়ন, ইন্টানেটের সংযোগ দেওয়া, ই-গভর্ন্যান্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প খাত গড়ে তোলা।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিক্ষার্থীদের রাজনীতি সচেতন হওয়ার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৪ঠা এপ্রিল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামেলার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে মন্ত্রী বলেন, কেবল ভালো শিক্ষার্থী হলে চলবে না, দেশকেও ভালোবাসতে হবে। এলক্ষ্যে তিনি ব্যক্তি জীবনে রাজনীতি না করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি রাজনীতি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। এর আগে তিনি খুলনা জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্‌বোধন ও ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৭ই এপ্রিল আগারগাঁও ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে 'জব ফেয়ার ২০১৯'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

দেশে ৪টি নতুন প্রকৌশল কলেজ করার আশ্বাস

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি দেশে আরো ৪টি নতুন প্রকৌশল কলেজ স্থাপনের কথা বলেন। ৭ই এপ্রিল ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে 'জব ফেয়ার' উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে একথা জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণে কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। নারী ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের উদ্দেশ্য করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শুধু চাকরিপ্রার্থী হলেই হবে না, যথার্থ জ্ঞান ও যোগ্যতা নিয়ে উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে হবে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বিদ্যমান কোটা ২০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রাথমিক বৃত্তি পেল ৮২ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী

পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে এ বছর মোট ৮২ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। এরমধ্যে ৩৩ হাজার ট্যালেন্টপুলে ও ৪৯ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে। ২৪শে মার্চ ২০১৯ সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মো. মোস্তাফিজুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে এ তালিকা প্রকাশ করেন। মন্ত্রী বলেন, ট্যালেন্টপুল বৃত্তিপ্রাপ্তদের মাসে ৩০০ টাকা এবং সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তদের মাসে ২২৫ টাকা করে দেওয়া হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বৃত্তির টাকা পাবে।

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ অন্যতম উদার বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্র

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'ব্যয়, মানবসম্পদ, অভ্যন্তরীণ বাজার, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ সুবিধা, বিনিয়োগ সুরক্ষা ও সামাজিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিচারে বাংলাদেশ বিনিয়োগের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান'।

২২শে এপ্রিল ২০১৯ ক্রনেই সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের যৌথ সভায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে এপ্রিল ২০১৯ ব্রুনাইয়ে হোটেল এম্পায়ার অ্যান্ড কান্ট্রি ক্লাবে বাংলাদেশ-ব্রুনাই যৌথ বিজনেস ফোরামের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দু দেশের অভিন্ন অগ্রযাত্রায় ব্রুনেইয়ের উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ অন্যতম বেশি উদার বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্র'। বাংলাদেশের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শতভাগ বিদেশি মালিকানা সুবিধা, পুরো পুঁজি ফেরত নেওয়ার সুবিধা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, জাপানসহ বিশ্বের বড়ো বড়ো মার্কেটগুলোতে প্রবেশাধিকার, বিদেশি বিনিয়োগ সুরক্ষা আইন, উদার ট্যাক্স নীতিমালা, মেশিনারিজ আমদানিতে কর রেয়াতসহ বিভিন্ন সুবিধার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্বিতীয় বৃহত্তম ও জিডিপির ভিত্তিতে বিশ্বে ৪১তম অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ, এখানকার শক্তিশালী বেসরকারি সেক্টর, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ও বিনিযোগের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

দু'দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এসময় চারটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী ব্রুনেই সফরের দ্বিতীয় দিনে সুলতানের সরকারি বাসভবন ইস্তানা নুরুল ইমান ভবনে সুলতান হাসানাল বলকিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। যেখানে সুলতান ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ব্রুনেইয়ের মধ্যে ৬টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয় এবং কূটনৈতিক নোট বিনিময় হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ

কোরিয়ার কোম্পানিসমূহ বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ান রাষ্ট্রদূত হু কং-ইল। ৭ই এপ্রিল ২০১৯ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী মো. আমিনুল ইসলামের সাথে তার কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভায় রাষ্ট্রদূত এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান স্যামসাং, এস কে ও হুন্দাই বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক্সসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। এ উদ্দেশ্যে কোরিয়ান প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদল বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির স্যাম্পল নিয়ে বাংলাদেশে আসবেন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে বিডা'র সহায়তা কামনা করেন তিনি।

বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী মো. আমিনুল ইসলাম কোরিয়ান প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশে স্বাগত জানান এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশে একটি কোরিয়ান অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইকোনমিক জোন) স্থাপনের প্রস্তাব দেন। কোরিয়ান অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ এক হাজার একর জমি সরবরাহ করতে প্রস্তুত বলে জানান বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান।

কোরিয়ান রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য নিয়ামক বিভিন্ন ক্ষেত্র সড়ক যোগাযোগ ও পরিবহণ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি প্রভৃতি খাতের দ্রুত উন্নয়নের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশে বড়ো পরিসরে বিনিয়োগ করতে চায় চীনা কোম্পানি

বাংলাদেশে একটিভ ফার্মাসিউটিকেল ইনগ্রেডিয়েন্টস (API), বায়োটেকনোলজি এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করতে চায় ফরচুন-৫০০ ভুক্ত চীনা কোম্পানি ZTE। ২৩শে এপ্রিল ২০১৯ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী মো. আমিনুল ইসলামের সাথে ঢাকায় বিডা কার্যালয়ে ZTE এবং মাগুরা গ্রুপের দশ সদস্যের একটি যৌথ প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎকালে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এই চীনা কোম্পানির প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা ভিওনসেন গু।

ZTE এবং মাগুরা গ্রুপ যৌথ বিনিয়োগে একটিভ ফার্মাসিউটিকেল ইনগ্রেডিয়েন্টস ও জৈব প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদান যেমন: হরমোন, এনজাইম, ভ্যাকসিন, রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রভৃতি উৎপাদন করার জন্য বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে আসতে চায় বাংলাদেশে। এসব কারখানার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০০ হেক্টর এবং পর্যায়ক্রমে তিন হাজার একর জমি বরাদ্দ চান ভিওনসেন গু। এছাড়াও তারা বাংলাদেশে একটি স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার ইচ্ছা পোষণ করেন।

কাজী মো. আমিনুল ইসলাম বার্ষিক ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এই চীনা প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশে তাদের বিনিয়োগকে স্বাগত জানান।

প্রতিবেদন: এস আর সবিতা

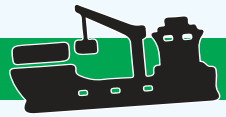

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে সুসময় ফিরেছে

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত বছর ৫৪০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়, যা ২০১৭ সালের চেয়ে ৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ বেশি। চলতি বছরের প্রথম মাসে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৮ দশমিক ৭০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীন ও ভিয়েতনামের পর তৃতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। তবে ২০১৩ সালে ২৪শে এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধসের পর বাজারটিতে রপ্তানি কমতে থাকে। সর্বশেষ ২০১৭ সালে ৫০৬ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হলেও তা ছিল ২০১৬ সালের চেয়ে সাড়ে ৪ শতাংশ কম। গত বছর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ঘুরে দাঁড়াতে থাকে বাংলাদেশ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল (অটেক্স) সম্প্রতি বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক আমদানির হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরেছে। তাদের তথ্যানুযায়ী, গত বছর ৮ হাজার ২৮৮ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যা ২০১৭ সালের চেয়ে ৩ দশমিক ৩৮ শতাংশ বেশি।

অটেক্সের তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র গত বছর ১৯৩ কোটি বর্গমিটার সমপরিমাণ কাপড়ের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৫১ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের বাজারে হিস্যা ছিল ৬ দশমিক ৩১ শতাংশ যা গত বছর শেষে সেটি বেড়ে ৬ দশমিক ৫২ শতাংশ হয়েছে। চলতি বছরের প্রথম মাসে ৫৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ৭০ শতাংশ।

দেশে জাপানি কোম্পানি বাড়ছে

বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানির সংখ্যা বাড়ছে। ২০০৮ সালে এদেশে জাপানি কোম্পানি ছিল মাত্র ৭০টি, যা ২০১৮ সালে ২৭৮টিতে উন্নীত হয়েছে। জাপানি বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা জাপান ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) বলছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার বড়ো হওয়া এবং উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় বিনিয়োগের আগ্রহের কারণ।

জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (জেবিসিআই) এক সংবাদ সম্মেলন করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাপানি কোম্পানিগুলোর ব্যবসা পরিস্থিতি নিয়ে এক জরিপ তুলে ধরার জন্য ওই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে জেবিসিসিআই। এতে জোটের প্রতিনিধি দাইসুকি আরাই জরিপে বাংলাদেশ নিয়ে জাপানি কোম্পানিগুলোর মতামত তুলে ধরেন।

দাইসুকি আরাই যে জরিপটি তুলে ধরেন, সেটি করা হয়েছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর ওপর। জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে গত বছরের ৯ই অক্টোবর থেকে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত। এতে বাংলাদেশে ব্যবসারত ৬২ শতাংশ জাপানি কোম্পানি বলেছে, ২০১৯ সালে তাদের পরিচালনা মুনাফা বাড়বে। এ হার এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২০ দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের উপরে আছে লাওস। প্রতিবেশী মিয়ানমার, ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশের পরে রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে ব্যবসারত ৭৩ শতাংশ জাপানি কোম্পানি বলেছে, তারা আগামী দু-এক বছরে এদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণ করবে।

বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী ইনভেস্টকর্প

বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টকর্প। তারা দেশের আবাসন খাত, ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আমেরিকা ও এশিয়া অঞ্চলে এখন পর্যন্ত ১৮৫টি প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ২০১৮ সাল শেষে ইনভেস্টকর্পের সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২৫০ কোটি ডলার।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

বস্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সরকারের উদ্যোগ

গৃহহীন ও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। ২০৪১ সাল নাগাদ বস্তিবাসীদের জীবনের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। সরকার বস্তির জায়গা, আশপাশে বা সুবিধাজনক স্থানে বহুতল আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভবনগুলোতে ছেটো ছোটো ফ্ল্যাট নির্মাণ করে নামমাত্র মূল্যে হতদরিদ্র বস্তিবাসীদের নামে বরাদ্দ দেওয়ারও পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে সরকার। পাশাপাশি দখলমুক্ত হওয়া বস্তির জায়গায় সরকারের ভারী শিল্প স্থাপনসহ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, সরকার গ্রামে শহরের সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রাম থেকে শহরে এসে মানুষকে যাতে বস্তিতে বসবাস করতে না হয়, গ্রামে

থেকেই যেন উপার্জন করতে পারে সেজন্য চাঙা করা হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি, এতে শহরের উপর মানুষের চাপ কমবে। নদীভাঙন প্রবণ এলাকার লোকেরা বস্তিতে বেশি বসবাস করে। কারণ আচমকা ভাঙনে বাড়িঘর জমিজমা হঠাৎ নদীতে বিলীন হয়ে যায়। এ জন্য নদী ভাঙন প্রবণ এলাকায় নদী শাসন ও বেড়িবাঁধ নির্মাণ প্রকল্পসহ ক্ষুদ্র ঋণ, একটি বাড়ি একটি খামারসহ বহু ছোটো ছোটো পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে। যাতে নদী ভাঙা মানুষদের শহরে এসে বস্তিতে থাকতে না হয়। বস্তিবাসীদের শিক্ষিত করতে শিক্ষামূলক নানা কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি স্কুল নির্মাণ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বাড়ানো হয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হিসাব অনুযায়ী, ঢাকায় বস্তির সংখ্যা দিন দিন কমছে। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা, নদী শাসনে অনেকেই বস্তি ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেছে। ২০৩০ সাল নাগাদ অন্তত ৫০ হাজার বস্তিবাসী অন্যত্র বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করার মতো সামর্থ্য হবে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সূত্র জানা যায়, দেশজুড়ে বস্তির সার্বিক উন্নয়নের জন্য আরবান পার্টনারশিপস ফর পোভার্টি রিডাক্সন প্রজেক্ট (ইউপিপিআর) নামে একটি প্রকল্প চালু রয়েছে। প্রকল্পটির জরিপ মোতাবেক দেশে ছোটো-বড়ো মোট ৪৫ হাজার বস্তি রয়েছে। এ বস্তিগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, টঙ্গী, ময়মনসিংহ, রংপুর, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, যশোর, কুমিল্লা, দিনাজপুর, নবাবগঞ্জ, বগুড়া, টাঙ্গাইল, সাভার. গাজীপুর, নওগাঁ, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ, পাবনা, চাঁদপুর, ফেনী, নীলফামারীর সৈয়দপুর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ ও ফরিদপুরে অবস্থিত।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বের পাঁচ সেরা নীতিনিষ্ঠের তালিকায় শেখ হাসিনা

বিশ্বের পাঁচ সেরা নীতিনিষ্ঠ নেতার অন্যতম বলে অভিহিত করেছে নাইজেরিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী দৈনিক *দ্য ডেইলি লিডারশিপ*। ১৪ই এপ্রিল সংবাদপত্রটি তার আনরিপোর্টেড বিভাগে প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ডস মোস্ট অস্টিয়ার প্রেসিডেন্ট' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ মন্তব্য করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনার সবচেয়ে অসাধারণ দুটি অর্জন

হলো– তাঁর নেতৃত্বের ভূমিকা এবং বঙ্গবন্ধুর খুনি ও ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারে সফলতা। শেখ হাসিনার মাসিক বেতন ৮০০ ডলার, উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, ফোর্বস-এর তালিকা অনুযায়ী বিশ্বের ১০০ ক্ষমতাধর নারীর মধ্যে শেখ হাসিনা ৫৯তম।

বিজিএমই'র প্রথম নারী সভাপতি

পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমই'র প্রথম নারী সভাপতি হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদী গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নির্বাচনি জোট সম্মিলিত ফোরামের প্যানেল লিডার রুবানা হক। ২০শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিএমই'র নতুন কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

৬ই এপ্রিল ঢাকা ও চট্টগ্রামে একযোগে ভোট গ্রহণ হয়। সংগঠনের ৩৫ পরিচালক নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হয় রুবানা হকের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত পরিষদ ও ফোরামের যৌথ প্যানেল। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের স্ত্রী রুবানা হক বিজিএমই'র ১৮তম সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন।

ওয়াও ঢাকা ২০১৯ ফেস্টিভ্যাল

ঢাকায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ওয়াও-উইমেন অব দ্য ওয়ার্ল্ড ফেস্টিভ্যাল'। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংস্থা ওয়াও ফাউন্ডেশনের অংশীদারিত্বে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ৫ ও ৬ই এপ্রিল এ ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে ২০টি বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা, গল্প বলাসহ নারী দলের বিভিন্ন পরিবেশনা ছিল। ছোটো-বড়ো মিলিয়ে পঞ্চাশটির মতো স্টল ছিল এ ফেস্টিভ্যালে।

নারীর সম্ভাবনা বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ খুঁজে বের করতে এবং সমস্যাগুলো নিয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা তৈরিতে ও সমাধান পেতে ২০১০ সালে ওয়াও উৎসব শুরু হয়। উৎসবটি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে ২০১৮ সালে ওয়াও ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়।

স্লোভাকিয়ায় প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট

স্লোভাকিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন লিবারেল প্রোগ্রেসিভ স্লোভাকিয়া পার্টির সদস্য আইনজীবী জুজানা কাপুতোভা। সম্প্রতি দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কূটনীতিক মারোস সেফকোভিচকে পরাজিত করে তিনি প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আইনজীবী হিসেবে সুখ্যাতি থাকা জুজানা ১৪ বছর ধরে অবৈধভাবে ভূমি ভরাট মামলায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশে সহায়তা করবে সরকার

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক খাত পোল্ট্রি শিল্প। এটি কৃষি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত, যা বর্তমানে একটি বৃহৎ শিল্প। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পুষ্টির ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এই শিল্প। এই শিল্পের বিকাশে সরকারের যা যা করণীয় তা করা হবে। ২রা এপ্রিল সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে পোল্ট্রি সেক্টরের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাসভায় এসব কথা বলেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে জাতীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পোল্ট্রি শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। এ খাতের প্রায় এক কোটি জনশক্তির মধ্যে ৪০ শতাংশ নারী রয়েছে। তিনি আরো বলেন, নিরাপদ মুরগি ও ডিম উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের

পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে রফতানি বাড়াতে হবে। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে এ শিল্পের উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়া হবে।

দেশে পোল্ট্রি ফিডের বার্ষিক উৎপাদন ২৭ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে বাণিজ্যিক ফিড মিলে উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় ২৫ দশমিক ৫০ লাখ মেট্রিক টন এবং লোকাল উৎপাদন প্রায় ১ দশমিক ৫০ লাখ মেট্রিক টন। বর্তমান বাজারে মুরগির মাংস ও ডিম সবচেয়ে নিরাপদ খাবার। পোল্ট্রি শিল্পের নেতৃবৃন্দ এই শিল্পের জন্য কিছু দাবি উত্থাপন করেন। মন্ত্রী তাদের সকল দাবি মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং তাদের সাথে একমত প্রকাশ করেন।

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ১৭ই এপ্রিল ২০১৯ ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মশলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প-এর জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

সরকার কৃষির উন্নয়নে সহায়তা করছে

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এদেশের কৃষিবিদ, বিজ্ঞানী, গবেষক সর্বোপরি আমাদের কৃষকদের একাগ্রতা নিষ্ঠা ও সক্ষমতার কারণে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কৃষিতে এখন আমাদের প্রয়োজন বিনিয়োগকারী, রপ্তানি বাজার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ। সরকার কৃষির সার্বিক উন্নয়নের জন্য সহায়তা করে আসছে। ৩রা এপ্রিল মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে ইউএসএআইডি'র মিশন পরিচালক ডেরিক ব্রাউনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করতে আসলে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিনিধিদল 'ফল আর্মি ওয়ার্ম' পোকাসহ ফসলের বিভিন্ন ক্ষতিকর পতঙ্গ প্রতিরোধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তারা ভবিষ্যতে ফসলের ক্ষতিকর পতঙ্গ দমনসহ মানসম্মত বীজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাশে থাকতে চায়। বাংলাদেশে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজনের বিষয়টি অনুধাবন করে এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সাথে তারা কাজ করবেন বলে মিশন পরিচালক ডেরিক ব্রাউন উল্লেখ করেন। ১৯৭১ সাল থেকে ইউএসএআইডি বাংলাদেশকে ৭শ' কোটি ডলারেরও বেশি উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করেছে। ২০১৭ সালে ইউএসএআইডি বাংলাদেশের জনগণের জীবনমানের উন্নয়নে প্রায় বিশ লাখ ডলার প্রদান করেছে। ফিড দ্য ফিউচারের টিম লিডার পেটরিক ওরলইউজ, সিনিয়র খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি নীতি উপদেষ্টা অনিরুদ্ধ হোম রায়, প্রাইভেট সেক্রেটারি অ্যাডভাইজার মো. মঈন উদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিতে গতানুগতিক ধারা পরিহার করুন

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, নতুন নতুন উন্নত জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষকদেরকে চাষে আকৃষ্ট করতে হবে। কৃষকরা আকৃষ্ট হবে, লাভবান হবে স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদন হয় এমন জাত কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে। কৃষিকে লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে একে সম্মানজনক পেশায় পরিণত করতে হবে। তাহলে দেশের শিক্ষিত তরুণরা এ পেশায় এগিয়ে আসবে। গতানুগতিক ধারা পরিহার করে নতুন উদ্যোমে কাজ করতে হবে। ১৭ই এপ্রিল রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটোরিয়ামে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালায় এসব কথা বলেন তিনি।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

কোটি যুবকের কর্মসংস্থান হবে বর্তমান সরকারের আমলেই

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, দেশ ডিজিটাল হওয়ার পাশাপাশি দেশে এখন শিল্পায়নও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ এখন বহুগুণে সক্ষম একটি দেশ। দেশের সকল বিভাগকে আইটি সক্ষমতার আওতায় আনা হচ্ছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন এলাকায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। এই কাজগুলোর জন্য বর্তমান সরকারের সময়েই অন্তত ৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। আর আমাদের দেশ বর্তমানে দক্ষ যুব শক্তিতে সবচেয়ে ভালো অবস্থায় আছে। দেশের যুব সমাজকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে একদিকে যেমন দেশের কোনো যুবক আর বেকার থাকবে না, অন্যদিকে বাংলাদেশও আগামী ২০২১ সালের মধ্যে একটি শক্তিশালী উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ৭ই এপ্রিল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পিকেএসএফ আয়োজিত 'যুবদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ' শীর্ষক যুব সম্মেলন ২০১৯-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল করিম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জসীম উদ্দিন।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন কর্মদক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরো কর্মদক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা প্রয়োজন। ৮ই এপ্রিল ২০১৯ ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায়

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ৮ই এপ্রিল ২০১৯ আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বের হয়ে বিশ্বে আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এর পেছনে মেধাবী ও কর্মস্পৃহা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই আগামী দিনেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আরো বেশি মেধাবী ও কর্মনিষ্ঠ কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করতে হবে। তিনি আরো বলেন, সারাবিশ্ব যখন জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে, তখন বাংলাদেশ সফলভাবে জঙ্গিবাদ মোকাবিলা করে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে। জঙ্গিবাদ মোকাবিলাসহ অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আরো নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। এসময় প্রতিমন্ত্রী সারাদেশ থেকে দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা বাছাইয়ে পিএসসি'র ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এসময় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পিএসসির সদস্য উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত ও ড. আব্দুল জব্বার খাঁন বক্তৃতা করেন।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন গড়ে তুলতে হবে

একাদশ জাতীয় সংসদের 'শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র প্রথম বৈঠক ৭ই এপ্রিল ২০১৯ কমিটি'র সভাপতি আমির হোসেন আমু'র সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কমিটি'র সদস্য ও শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এ কে এম ফজলুল হক, আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন, মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান, কাজিম উদ্দিন আহম্মেদ এবং পারভীন হক সিকদার অংশগ্রহণ করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের সার্বিক কার্যাবলি সম্পর্কে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। রপ্তানিযোগ্য ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সার উৎপাদন ও সরবরাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নে মন্ত্রণালয়কে কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুল হালিমসহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

উৎপাদন বাড়লে শ্রমিকরা বেশি সহায়তা পাবেন-শ্রম প্রতিমন্ত্রী

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, যত বেশি উৎপাদন বাড়বে শ্রমিকরা তত বেশি লাভবান হবেন। উৎপাদন বাড়লে রপ্তানি বাড়বে, নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় তহবিলে বেশি অর্থ জমা হবে। শ্রমিকরা বেশি সহায়তা পাবেন। প্রতিমন্ত্রী ৯ই এপ্রিল ২০১৯ বিজিএমইএ-এর অডিটোরিয়ামে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে কর্মরত অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা ও শ্রমিকের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। শ্রম প্রতিমন্ত্রী গার্মেন্টস শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেন, শিল্পে শান্তি রক্ষা করুন, উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখুন। প্রতিমন্ত্রী শ্রমিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। এ অনুষ্ঠানে ৯৭ জন অসুস্থ গার্মেন্টস শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য ৩১ লাখ ১০ হাজার এবং ৮২ জন মেধাবী সন্তানের জন্য ১৬ লাখ ৪০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করা হয়। এ তহবিল থেকে এ পর্যন্ত ২ হাজার ৮ শত ৪২ জন শ্রমিকের চিকিৎসা, তাদের মেধাবী সন্তানের শিক্ষাবৃত্তি, নিহত শ্রমিকদের স্বজনদের মাঝে ৫৬ কোটি ৪৯ লাখ ৫০ হাজার এবং ২ হাজার একশ ৯৯ জন শ্রমিকের বিমা দাবি বাবদ ৪৩ কোটি ৯৮ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

পুলিশের ডিজিটাল কার পার্কিং

পুলিশ প্রধান (আইজিপি) ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বলেন, আমাদের বড়ো বড়ো শহর বিশেষ করে ঢাকায় জায়গা খুব অপ্রতুল। তাই জায়গার সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে মাল্টিলেভেল ডিজিটাল কার পার্কিং একটি অনন্য উদ্যোগ। এর ফলে অল্প জায়গায় বেশি পরিমাণ গাড়ি পার্ক করা সম্ভব। ৯ই এপ্রিল আব্দুল গণি রোডে ডিএমপির কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারের পাশে ৮ তলা ডিজিটাল কার পার্কিং উদ্‌বোধন কালে তিনি একথা বলেন।

আইজিপি বলেন, পরীক্ষামূলকভাবে এ পার্কিং স্থাপন করা হয়। পর্যায়ক্রমে বড়ো বড়ো শহরে এ ধরনের পার্কিং স্থাপন করা হবে। মেসার্স আজিজ অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডে ডিজিটাল কার পার্কিং নির্মাণ করেছে। এ পদ্ধতিতে ৩৪টি গাড়ি পার্ক করা যাবে। অথচ স্বাভাবিকভাবে একই পরিমাণ জায়গায় গাড়ি পার্ক করা যেত মাত্র ৬টি। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএমপি কমিশনার মো. আছাদুজ্জামান মিয়া, অতিরিক্ত আইজিপি ড. মো. মইনুর রহমান চৌধুরী, অতিরিক্ত আইজিপি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামসহ উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা এবং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

সারা দেশে ট্রাফিক পক্ষ শুরু

সারা দেশে ১৬ই এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে 'ট্রাফিক পক্ষ'। চলবে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত। জনসাধারণকে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সড়ক ও মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে সারাদেশে 'ট্রাফিক পক্ষ' পালিত হয়। ১৫ই এপ্রিল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এআইজি (ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট) এ কে এম মোশারফ হোসেন মিয়াজী স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ তথ্য জানানো হয়।

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাস চলবে ছয় কোম্পানির মাধ্যমে

ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলাচলরত নগর পরিবহণের বাসগুলোকে ৬টি কোম্পানির আওতায় এনে ২২টি রুটের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন। ১০ই এপ্রিল নগর ভবনসহ ব্যাংক ফ্লোর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত গণপরিবহণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আসার লক্ষ্যে গঠিত বাসরুট রেশনালাই জেসন সংক্রান্ত কমিটির সভা শেষে একথা জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, ৬টি বাস কোম্পানিকে গোলাপি, কমলা, সবুজ, বেগুনি, মেরুন এবং নীল এই ৬টি রঙের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তনকে পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য নিরাপত্তা হুমকি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনকে পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য 'নিরাপত্তা হুমকি' বলে উল্লেখ করেন। এই হুমকি মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। ২৬শে মার্চ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি লিখেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করার এখনই সময়। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বাংলাদেশে এসে দেখে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে নীরবে এখানকার লাখো মানুষের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে তা দেখাতে প্রস্তুত আছি।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে শিশুরা

সরকারের শিশুবান্ধব নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও এদেশের শিশুরা বিবিধ ঝুঁকির মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে। অনেক ঝুঁকি একান্ত প্রকৃতিগত। সম্প্রতি জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ১ কোটি ৯০ লাখেরও বেশি শিশুর জীবন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সরাসরি ঝুঁকিতে রয়েছে। ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আরো বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। তারা শিশুদের পর্যাপ্ত খেতে দিতে পারছে না, তাদের সুস্থ রাখতে পারছে না। তাদের শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। খরা বা সাইক্লোনের মতো মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধির অর্থ হলো আক্রান্ত পরিবারগুলো আরো বেশি দরিদ্র হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত পরিবারগুলো যখন ঘরবাড়ি হারাচ্ছে, তখন সেই পরিবারের শিশুরা অর্থ উপার্জনের জন্য কোনো না কোনো কাজে যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে। এই অবস্থায় দায়িত্ব নিতে না পেরে মেয়ে শিশুদের অনেক পরিবার দ্রুত বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে শিশুরা যে ভয়াবহ ঝুঁকির সম্মুখীন তা অনেকের কাছে অজানা।

জলবায়ু পরিবর্তন শিশুদের জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে এই প্রথম কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করল ইউনিসেফ। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের বিপরীতে যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে তা নতুন মাত্রা পাবে। প্রতিবেদনে যে দুর্বিষহ তথ্যটি উঠে এসেছে তা হলো, জলবায়ু পরিবর্তন বহু শিশুর বাল্যকাল কেড়ে নিচ্ছে। জীবনের তাগিদে তাদের অনেকে দ্রুত বড়ো হয়ে উঠছে এবং নিজের দায়িত্ব নিজের নিতে হচ্ছে।

আজকের শিশু দেশের ভবিষ্যৎ। যথার্থ কারণেই শিশু সুরক্ষায় আরো যত্নবান হতে হবে। সরকার শিশুদের নিরাপদ ও সুষ্ঠু জীবন নিশ্চিন্তে আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি সেবামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

আখাউড়া-সিলেট রেলপথ প্রকল্প

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক) নির্বাহী কমিটি রেলওয়ের আখাউড়া-সিলেট রেলপথ প্রকল্পে ১৬ হাজার ১শ ৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা অনুমোদন দিয়েছে। সার্বিকভাবে রেলপথের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্তমান মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত এই অর্থ ব্যয় হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ৯ই এপ্রিল রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

আখাউড়া-সিলেট ডুয়েল গেজে প্রকল্পটি ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। এটি বাস্তবায়নে প্রকল্প সহায়তা হিসেবে জি টু জি'র আওতায় ১০ হাজার ৬৫৪ কোটি ৩৬ লাখ টাকা চীন থেকে নেওয়া হবে। প্রকল্পের আওতায় ২২৫ কিলোমিটার মিটার গেজ রেলপথ ২৩৯ দশমিক ১৪ কিলোমিটার ডুয়েল গেজে রূপান্তরিত করা হবে।

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, অপর প্রধান প্রকল্পের আওতায় ৪৯টি বড়ো, ২৩৭টি ছোটো রেলসেতু, ২২টি স্টেশনের সিগনালিং ব্যবস্থা, ১৬ হাজার ৬৯০ বর্গমিটার আবাসিক ভবন নির্মাণ, ব্যারাক ও ডরমিটরি এবং ২শ দশমিক ৩০ একর ভূমি অধিগ্রহণ রয়েছে। একনেক সভায় দেশে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ৯১৯ দশমিক ৮৫ কোটি টাকার ভারতীয় অর্থনৈতিক জোনের অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২১ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে এপ্রিল ২০১৯ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজশাহী-ঢাকা বিরতিহীন ট্রেন 'বনলতা এক্সপ্রেস' পতাকা উড়িয়ে উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

উত্তরা ও মতিঝিলে চক্রাকার বাস সার্ভিস

রাজধানীর গণপরিবহনে শৃঙ্খলা ফেরানো ও যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। এবার তারই ধারাবাহিকতায় উত্তরা ও মতিঝিলে পৃথকভাবে চালু হতে যাচ্ছে এ সেবা কার্যক্রম। বাস রুট রেশনালাইজেশন সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত ৩রা এপ্রিল ২০১৯ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র সাঈদ খোকনের সভাপতিত্বে দক্ষিণ নগর ভবনে কমিটির এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

কমিটির পঞ্চম বৈঠকে মেয়র বলেন, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে মতিঝিলে চক্রাকার এ বাস সার্ভিস চালু হবে। সেই সঙ্গে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তরায় এ চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু হবে। এই সেবার মাধ্যমে কম খরচে স্বাচ্ছন্দে যাত্রীরা চলাচল করতে পারবেন। পাশাপাশি যানজট নিরসনেও চক্রাকার বাস সার্ভিস ভূমিকা রাখবে।

প্রতিটি বাসেই র‍্যাপিড পাস কার্ডের মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া যাবে। মেয়র বলেন, নির্দিষ্ট কোম্পানির তত্ত্বাবধানে সাড়ে চার হাজার বাস নামানো হবে। পুরো রুট রেশনালাইজেশন কাজ শেষ হতে দু'বছর সময় লাগবে। কারণ এখানে টার্মিনাল, ডিপো, চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব চক্রাকার বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রক্রিয়ার ছোটো ছোটো অংশ। ধানমন্ডি-নিউমার্কেট-আজিমপুর রুটের চক্রাকার বাস সেবা এরই মধ্যে চালু হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই যাত্রীরা এর সার্বিক সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

ডিএসসিসি মেয়র সাঈদ খোকনের সভাপতিত্বে সভায় ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক সচিব আবুল কালাম আজাদ, বিআরটিসি চেয়ারম্যান ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, বিআরটিএ চেয়ারম্যান মশিউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পহেলা বৈশাখে চালু রাজশাহী-ঢাকা বিরতিহীন ট্রেন

রাজশাহী-ঢাকা বিরতিহীন ট্রেন অনুমোদন দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন। ১লা এপ্রিল এক বিবৃতিতে এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। রাজশাহী সিটি মেয়র নির্বাচনের সময় নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল রাজশাহী-ঢাকা বিরতিহীন ট্রেন চালুকরণ। এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন নির্বাচনের পূর্বে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, নির্বাচনে বিজয়ী হলে ছয় মাসের মধ্যেই রাজশাহী-ঢাকা বিরতিহীন ট্রেন চালু করবেন। নির্বাচনে বিজয় লাভের পর রাজশাহীবাসীর কাছে তার নির্বাচনি ওয়াদা পূরণের কাজ শুরু করেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় চলতি মাস থেকেই রাজশাহী-ঢাকা বিরতিহীন ট্রেন চালু হয়েছে।

এ ব্যাপারে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন বলেন, রাজশাহী-ঢাকা বিরতিহীন ট্রেন অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মেয়র আরো বলেন, সপ্তাহে একদিন বাদে বাকি সবদিন ট্রেনটি সকালে রাজশাহী থেকে ঢাকায় যাবে আবার সেদিনই পুনরায় ঢাকা থেকে রাজশাহী ফিরবে। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন (১৪ই এপ্রিল) থেকে ট্রেনটি চালু হয়েছে। ট্রেনটিতে মালয়েশিয়া থেকে আনা উন্নতমানের নতুন কোচ থাকবে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদক নির্মূলে তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান

তরুণ সমাজ দেশ গড়ার কারিগর। তরুণদের মাধ্যমে এদেশের ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। এসময় তরুণ সমাজকে মাদক নির্মূলে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান– স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। ১৬ই এপ্রিল ২৪ রংপুর ৬-এ পীরগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহিদমিনার চত্বরে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত পীরগঞ্জ পৌরসভা ও উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে একযোগে 'এসো আমরা মাদককে না বলি' শীর্ষক মাদকবিরোধী অভিযান উদ্‌বোধন ও শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি মাদকবিরোধী হিসেবে নিজেদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করতে

শিক্ষার্থীদের অনুরোধ জানান। পরে তাদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করেন এবং শহিদমিনার চত্বরে গাছের চারা রোপণ করেন। স্পিকার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সকল দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সারাদেশে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে তরুণদের মাদক থেকে বিরত থাকতে হবে। এসময় তিনি তরুণদের মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান একটি ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠান। মাদক শারীরিক ও মানসিক দুভাবেই ক্ষতি করে থাকে। তিনি মাদকরিাধী এ প্রচারণা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে নিয়মিত আলোচনাসভা, বির্তক প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

বাস চালকদের মাদক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন, ডোপ টেস্ট (মাদক পরীক্ষা) ও টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া বাস চালাতে পারবে না চালকেরা। এলক্ষ্যে চালকদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে ডোপ টেস্ট (মাদক পরীক্ষা)। ৪ঠা এপ্রিল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) নগর ভবনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে ডিএনসিসি-র নেওয়া নানামুখী উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মেয়র বলেন, চালকদের ডোপ টেস্ট (মাদক পরীক্ষা) বাধ্যতামূলক করার প্রথমিক সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। ডোপ টেস্ট ও টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া কোনো চালক বাস চালাতে পারবে না।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা সপ্তাহ-২০১৯' উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৭ই এপ্রিল পালিত হয়েছে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস'। দিনটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'সমতা ও সংহতি নির্ভর সর্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা'। দিবসটি উপলক্ষে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করে। এ উপলক্ষে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে পাঁচ দফা সংস্কার প্রস্তাব করে একটি ধারণাপত্র তৈরি করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ। প্রস্তাবগুলো হলো– ব্যবস্থাপনা, জনবল, সেবা, অর্থায়ন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় (ইউনিভার্সল হেলথ কাভারেজ) অর্থ প্রত্যেক মানুষ প্রয়োজনের মুহূর্তে মানসম্পন্ন সেবা পাবে। সেবার জন্য মানুষ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে। অর্থের অভাবে মানুষ সেবাবঞ্চিত থাকবে না, ব্যয় বহন করতে গিয়ে নিঃস্ব হবে না।

জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা সপ্তাহ পালন

দেশজুড়ে ১৬ই এপ্রিল থেকে ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত পালন করা হয় 'জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা সপ্তাহ' বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্বাস্থ্যসেবা সপ্তাহের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সেবা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য ছিল– স্বাস্থ্যসেবা অধিকার, শেখ হাসিনার অঙ্গীকার'। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভেষজ, আয়ুর্বেদিক, ইউনানি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে উপেক্ষা না করার আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্যসেবা সপ্তাহ উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল– বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, চিকিৎসা সেবায় নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা।

দেশের প্রথম ডায়াবেটিস মেলা

দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয় তিন দিনব্যাপী ডায়াবেটিস মেলা। ১১ই এপ্রিল রাজধানীর খামারবাড়ি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে শুরু হয় এ মেলা। চলে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত। মেলার প্রতিপাদ্য ছিল–'ডায়াবেটিস আমার, দায়িত্বও আমার'। ডায়াবেটিস মেলা উদ্‌যাপন কমিটি এই মেলার আয়োজন করে। মেলার উদ্‌বোধন করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংসদ আসাদুজ্জামান নূর।

তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ মেলায় ২৫টি অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি আগ্রহীরা বিনামূল্যে রক্তের শর্করা, চোখ পরীক্ষা ও সুলভে শর্করা পরিমাপের যন্ত্র কেনার সুযোগ পান। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের পর 'ডায়াবেটিস কী: জানতে হবে, মানতে হবে' শীর্ষক অধিবেশনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগী ও মেলায় আসা সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রসূতিসেবায় নয়বার দেশসেরা তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন

প্রসূতিসেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় সারাদেশে শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রের পুরস্কার পেয়েছে 'তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র'। ২০০৬ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত নয়বার দেশসেরার মর্যাদা পায় এ কেন্দ্রটি।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সূত্রে জানা যায়, মার্চ মাসের ১৯ তারিখ পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ৭৫ জন প্রসূতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান জন্ম দিয়েছেন, ফেব্রুয়ারি মাসে ১১২ জন, জানুয়ারি মাসে ১১৮ জন প্রসূতি এখানে সন্তান জন্ম দেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির ঈর্ষণীয় সাফল্যের পেছনে যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন এই কেন্দ্রের পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা (এফডব্লিউভি) নাহিদ সুলতানা। প্রসূতিসেবায় বিশেষ অবদান রাখায় তিনিও নয়বার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকার পুরস্কার পান।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ডা. লোটে শেরিং ১৪ই এপ্রিল ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সুরের ধারা আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

নববর্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা

বৈশাখের প্রথম দিন সকালে মানুষের কোলাহল, হর্ষধ্বনি, গান ও ঢাকঢোল মিলে যে ঐকতানের সৃষ্টি হয় তাতে মুখর হয়ে উঠে চারুকলা চত্বর। সকাল নয়টায় শুরু হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। 'মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে' প্রতিপাদ্যে ১৪২৬ সালের বাংলা নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ঢাকঢোলের বাদ্যি আর তালে তালে তরুণ-তরুণীদের নৃত্য হই-হুল্লোড় আর আনন্দ-উল্লাসে মাতিয়ে রাখে পুরো শোভাযাত্রা।

পহেলা বৈশাখে সকাল সোয়া ছয়টায় ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং সস্ত্রীক ও তাঁর সফরসঙ্গী ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তানভী দর্জিসহ অন্যদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন চ্যানেল আই সুরের ধারা আয়োজিত কণ্ঠে বর্ষবরণ ১৪২৬ অনুষ্ঠানে। এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন– জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, বাংলাদেশে ভারতের হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাস ও চ্যানেল আইয়ের পরিচালক শাইখ সিরাজ।

সত্যেন সেন সম্মান প্রদান

সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর দ্বাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ৩০শে মার্চ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজন করা হয় সত্যেন সেন সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ বছর সত্যেন সেন সম্মাননা-২০১৯ পদকে ভূষিত করা হয় সৈয়দ হাসান ইমামকে। শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি হায়াৎ মামুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফকির আলমগীর ও ঝুনা চৌধুরী।

ইংরেজিতে মুক্তিযুদ্ধের ২১টি গল্প

মুক্তিযুদ্ধের ২১টি গল্পের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে অ্যাডন পাবলিকেশন প্রকাশ করেছে গল্প সংকলন 'দ্য ক্রনিকলস অব ১৯৭১: অ্যানথোলজি অব টোয়েন্টি ওয়ান স্টোরিজ অন বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার'। সংকলনটিতে রয়েছে বাংলাদেশের ২১ জন লেখকের ২১টি গল্প। গল্পগুলো অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক হারুনুজ্জামান। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বাতিঘরে ৩১শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয় বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠান। কবি আসাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ২৪শে এপ্রিল আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি মেলা ২০১৯'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এসময় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রযুক্তির বহুবিধ ব্যবহারে প্রতিবন্ধীদের কর্মমুখী করে গড়ে তোলা সম্ভব

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বলেন, সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলে আলাদা কোনো মানুষ নেই। আমাদের সবার মধ্যে কিছু না কিছু দুর্বলতা রয়েছে। কারো মধ্যে হয়ত এটি বেশি বা কারোর মধ্যে কম। সেই বিবেচনায় আমরা সবাই কমবেশি প্রতিবন্ধী। ২৫শে এপ্রিল ২০১৯ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি অডিটোরিয়ামে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি মেলা ২০১৯'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দুর্বলতা ও বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব। প্রযুক্তির বহুবিধ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজে প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিচিতদের কর্মমুখী করে গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে আমাদের আর প্রতিবন্ধীদের মধ্যে

কোনো পার্থক্য নেই। তাই প্রতিবন্ধীদের সব সুবিধা নিশ্চিত করতে কাজ করবে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তির আওতায় আনা হবে। তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হওয়া প্রতিবন্ধীরা সাধারণ, সুস্থ ও সবল মানুষের চেয়ে কম নয় বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শোনা-বলা-পড়া ও লেখার ভিত্তিতে মূল্যায়ন তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা না রাখার ব্যাপারে কাজ শুরু করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আশা করা হচ্ছে, আগামী বছর থেকে এ ব্যবস্থা চালু হবে। তবে এসব

শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে একটি ধারণাপত্র তৈরি করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আকরাম-আল-হোসেন বলেন, তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দিয়ে কোন পদ্ধতিতে মূল্যায়ন হবে সে বিষয়ে একটি ধারণাপত্র তৈরি করা হয়েছে। একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে, তারা অংশীজনদের মতামত নিয়ে মূল্যায়ন পদ্ধতি চূড়ান্ত করবে। এরপর পরীক্ষা তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ধারণাপত্র থেকে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের শোনা-বলা-পড়া ও লেখা এই চারটি বিষয়ের ওপর মূল্যায়ন করে পরবর্তী ক্লাসে উন্নীত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন শেষ করবেন। প্রতি মাসে একবার করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীদের কোনো নম্বর দেওয়া হবে না।

শিশু অধিকার রক্ষায় কনসার্ট

শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেবিআই) মিলনায়তনে ১৯শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় 'চাইল্ড রাইটস অ্যাওয়ারনেস কনসার্ট'। এতে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন ও হাসান আবিদুর রেজা জুয়েল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ববিতা। এছাড়া ছিল নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশনা। কনসার্টটি আয়োজন করে ডিস্ট্রেসড চিলড্রেন অ্যান্ড ইনফ্যান্টাস ইন্টারন্যাশনাল। শিশুশ্রম রোধ, শিশু অধিকার সুরক্ষা, অন্ধত্ব নিবারণসহ শিশুদের অধিকার রক্ষায়, সচেতনতা বৃদ্ধি করা এ কনসার্টের উদ্দেশ্য।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

ফুল ভাসিয়ে প্রাণের বৈসাবি উৎসব

বৈসাবি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রাণের উৎসব। বাংলা পুরোনো বর্ষ বিদায় করে, নতুন বর্ষবরণ উপলক্ষে এই উৎসব পালিত হয়ে থাকে। নদীতে ফুল ভাসানোর মধ্য দিয়ে ১২ই এপ্রিল পাহাড়ে শুরু হয় চাকমাদের বিজু, ত্রিপুরাদের বৈসুক ও তঞ্চঙ্গ্যাদের বিষু উৎসব। তিনদিনব্যাপী এই উৎসবের প্রথম দিনে বাড়িঘর পরিষ্কারের পর নদীতে স্নান করে পরিশুদ্ধ হয় পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা। এই দিনে তরুণ-তরুণী, শিশুসহ নানা বয়সের মানুষ দলবেঁধে ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে পানিতে ফুল ভাসিয়ে দেয়। ভাসানোর জন্য এই ফুল কিশোর-কিশোরীরা এর আগের দিন মধ্যরাতে সংগ্রহ করে থাকে। প্রথম দিন ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে দলবেঁধে ঘুরে বেড়ানোর রেওয়াজ আছে। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে হরেক রকমের খাবার দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে আপ্যায়ন করে এরা অতিথিদের। তবে পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ১৩ই এপ্রিল শুরু হয় বৈসাবির মূল উৎসব। বৈসাবি উপলক্ষে বান্দরবান শহরের বালাঘাটায় তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী মিলাখেলার আয়োজন করে থাকে। সেই খেলার উদ্‌বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। অন্যদিকে, ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বৈসুক উপলক্ষে ত্রিপুরা সংস্কৃতি

মেলা ও গরাইয়া নাচের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নববর্ষ অর্থাৎ ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বৈসু উৎসবের সপ্তাহখানেক আগে থেকেই পুরোনো বছরের বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ত্রিপুরা গ্রামগুলোয় শুরু হয় গড়াইয়া নাচ। ত্রিপুরাদের বিশ্বাস, নাচের মধ্যদিয়ে তুষ্ট হন গড়াইয়া দেব। এতে পরিবার এলাকাবাসী ও সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি অটুট থাকে। গড়াইয়া নাচের উদ্দেশ্য গৃহস্থের মঙ্গল কামনা।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলা বর্ষকে বিদায় জানানোর এ অনুষ্ঠান তাদের প্রধান সামাজিক উৎসব হিসেবে বিবেচিত। এই উৎসব নানা নামে পরিচিত যেমন: চাকমা জনগোষ্ঠীর বিজু নামে, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সাংগ্রাই, মারমা জনগোষ্ঠী বৈসুক, তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী বিষু, কোনো কোনো জনগোষ্ঠী বিহ নামে পালন করে থাকে। বৈসুরোধে সাংগ্রাইয়ের সা, ও বিজু, বিষু ও বিহুর বি নিয়ে উৎসবটিকে সংক্ষেপে বৈসাবি নামে পালন করা হয়। পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর থেকে পাহাড়ের সব জনগোষ্ঠীকে সম্মিলিতভাবে উৎসবে একীভূত করার জন্য সংক্ষেপে নামটি প্রচলন করা হয়। সবশেষে নানা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ১৪ই এপ্রিল শেষ হয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রাণের উৎসব বৈসাবি।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলায় হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিক বাংলা ভাষায় নির্মিত হবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল। ১লা এপ্রিল বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনে (বিএফডিসি) অভিনয় শিল্পী ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলিউডের খ্যাতিমান এই চলচ্চিত্র

নির্মাতা। শ্যাম বেনেগাল বলেন, বাংলাদেশের মাটি ও হাওয়ায় বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। এ দেশের মাটির নির্যাস মিশে থাকবে এ চলচ্চিত্রে। এ কারণে ছবিটি নির্মিত হবে বাংলা ভাষায়। তিনি আরো বলেন, চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে হলেও বেশিরভাগ শিল্পী ও কলাকুশলী বাংলাদেশ থেকে নেওয়া হবে।

নবম সার্ক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের পাঁচ চলচ্চিত্র

শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর ন্যাশনাল ফিল্ম করপোরেশনের দি সিনেমা হলে নবম সার্ক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৭-১২ই মে পর্যন্ত এই উৎসব চলে। এবারের উৎসবে বাংলাদেশের ৫টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। উৎসবের মাস্টার বিভাগে প্রদর্শিত হয় নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর *আলফা*, পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে প্রতিযোগিতা করেছে তৌকির আহমেদের *ফাগুন হাওয়ায়* এবং নুর ইমরান মিঠুর *কমলা রকেট*। এছাড়াও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে প্রতিযোগিতা করেছে নোমান রবিনের *কোয়ার্টার মাইল কান্ট্রি*, চৈতালী সমাদ্দার ও সাইফুল আকবর খানের *সি ইউ*।

৪১তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে *শনিবার বিকেল*

মস্কো ৪১তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত হয়েছে মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীর *শনিবার বিকেল* চলচ্চিত্রটি। এ উৎসব চলে ১৮ই থেকে ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত। এতে অভিনয় করেছেন– জাহিদ হাসান, নুসরাত ইমরোজ তিশা, মামুনুর রশিদ, ইরেশ যাকের, ইন্তেখাব দিনার, গাউসুল আলম শাওন, নাদের চৌধুরী, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, প্যালেস্টাইনের ইয়াদ হুরানি এবং আরো অনেকে।

রুনা লায়লার গানের কথায় চলচ্চিত্রের নাম

'সুপার রুনা' অ্যালবামটি ইএমআই প্রকাশ করেছে ১৯৮২ সালের ১লা ডিসেম্বর। এ অ্যালবামে বাপ্পি লাহিড়ীর সুর করা ১০টি গান গেয়েছিলেন রুনা লায়লা। এই অ্যালবামের অন্যতম জনপ্রিয় গান ছিল 'দে দে পেয়ার দে'। গানটির গীতিকার অঞ্জন। এই জনপ্রিয় গানটির প্রথম লাইন নিয়ে একটি ছবি তৈরি হয়েছে। নাম 'দে দে পেয়ার দে'। ছবিটি পরিচালনা করেছেন আকিব আলী। এতে অভিনয় করেছেন– অজয় দেবগন, টাবু ও বকুল প্রীত সিং।

মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার ২০১৮

মেরিল প্রথম আলো পুরস্কারের ২১তম আসর বসে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২৬শে এপ্রিল। পাঠক জরিপে এ বছর একঝাঁক তারকারা পুরস্কার পান। যাঁরা পুরস্কার পান তারা হলেন– পাঠক জরিপে সেরা নবীন অভিনয় শিল্পী হিসেবে পুরস্কার পান *দেবী* ছবির জন্য অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া, সেরা নায়িকা শিল্পী কনা, সেরা গায়ক ইমরান, টিভি নাটকে সেরা অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী (*বুকের বাঁ পাশে*), সেরা অভিনেতা আফরান নিশো, সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী পূজা চেরী রায় (*পোড়া মন টু*), সেরা নায়ক সিয়াম (*পোড়া মন টু*)। বিশেষ সমালোচক জরিপে পুরস্কার পান পরীমনি (*স্বপ্নজাল*), অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী (*দেবী*), এই বিভাগে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান জয়া আহসান, সেরা পরিচালক ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর

রেজা সাগর (*কমলা রকেট*), সেরা টিভি চিত্রনাট্যকার রেদওয়ান রনি (*পাতা ঝরার দিন*), নাটকের জন্য সেরা অভিনেত্রী রুমানা রশিদ ঈশিতা (*পাতা ঝরার দিন*), সেরা অভিনেতা সৈয়দ হাসান ইমাম (*পাতা ঝরার দিন*)। একই বিভাগে যৌথভাবে সেরা নির্দেশকের পুরস্কার পান মাহমুদুল হাসান আদনান ও নাজমুল নবীন (*মর্ডার্ণ টাইমস*) নাটকের জন্য। মেরিল প্রথম আলোর উদ্যোগে আগামীর নির্মাতা হিসেবে পুরস্কার পান তাসমিয়া আফরিন মৌ লস্কর নিয়াজ ও তানভীর মাহমুদ চৌধুরী। এ বছর মেরিল প্রথম আলো আজীবন সম্মাননা পুরস্কারে ভূষিত হন নাট্যজন আলী যাকের।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর বসছে ইংল্যান্ডে। ৩০শে মে থেকে শুরু হবে এ ক্রিকেটের আসর। নিয়মানুযায়ী সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২০১৯ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ১৬ই এপ্রিল দুপুর সাড়ে ১২টায় মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কনফারেন্স হলে জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। অপেক্ষার পালা শেষে জানা গেল কোন স্বপ্নসারথি বিশ্ব কাপে বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন। যাদের কাঁধে ভর করে দেশের ১৬ কোটি মানুষ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নে বিভোর থাকবে। তাঁরা হলেন– মাশরাফি বিন মর্তুজা, সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, রুবেল হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ, লিটন কুমার দাস, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, মুশফিকুর রহীম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, মোস্তাফিজুর রহমান, মোসাদ্দেক হোসেন, সাব্বির রহমান, সৌম্য সরকার, আবু জায়েদ রাহী ও মোহাম্মদ মিঠুন।

বিশেষ অলিম্পিকে বাংলাদেশের বিশাল অর্জন

গত ১৯শে মার্চ আবুধাবি ও দুবাইয়ে চলমান বিশেষ অলিম্পিকে ১৬টি স্বর্ণ পদক জিতেছে বাংলাদেশ বিশেষ অলিম্পিক দল। তারা সাতটি রৌপ্য এবং দুটি ব্রোঞ্জ জিতেছে। দৌড়, সাঁতার, বৌছি, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, হ্যান্ডবল (নারী), হ্যান্ডবল (পুরুষ সমন্বিত), ফুটবল (নারী ও পুরুষ সমন্বিত), ভলিবল ও বাস্কেটবল (সমন্বিত) মোট ১১টি বিভাগে ১৩৯ জন সদস্য বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করে।

আট দিনের এই অলিম্পিকে ১৯০টি দেশের মোট ৭ হাজার খেলোয়াড় অংশ নেয়। এর আগে গত ১৮ই মার্চ বাংলাদেশ ১৩টি স্বর্ণ, ছয়টি রৌপ্য এবং দুটি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। সাঁতারে পাঁচটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য এবং একটি ব্রোঞ্জ, বৌছিতে ৪টি স্বর্ণ, টেবিল টেনিস এবং ব্যাডমিন্টনে দুটি করে স্বর্ণ, দৌড়ে চারটি রৌপ্য এবং বাস্কেটবল খেলায় ১টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে বাংলাদেশ।

চট্টগ্রাম আবাহনীকে ৩-০ গোলে হারাল বসুন্ধরা কিংস

বসুন্ধরা কিংসের কাছে পাত্তাই পেল না চট্টগ্রাম আবাহনী। ১৮ই এপ্রিল নীলফামারী শেখ কামাল স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে প্রথম গোলের দেখা পায় বসুন্ধরা কিংস। গোলটি করেন কিরগিজস্তানের মিডফিল্ডার বখতিয়ার। ৭৮ মিনিটে কলিনদ্রেস গোলের সংখ্যা দ্বিগুণ করেন। ম্যাচের ৮৫তম মিনিটে তৃতীয় গোলের দেখা পায় বসুন্ধরা কিংস। গোলটি করেন দা কস্তা সোয়ারেস। এই জয়ে ১২ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রইল প্রিমিয়ার লীগের চলতি আসরে অপরাজিত থাকা বসুন্ধরা কিংস।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

চলে গেলেন কৌতুকাভিনেতা আনিস

মিতা খান

সবাইকে কাঁদিয়ে প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা আনিস ২৮শে এপ্রিল না ফেরার দেশে চলে গেলেন। পুরান ঢাকার ১৩/১, অভয়দাশ লেন টিকাটুলির নিজ বাসা কলেজ ভিউ টাওয়ারের প্রথম তলায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

অভিনেতা আনিসের জন্ম ১৯৪০ সালে ভারতের জলপাইগুড়িতে। বাবা মরহুম আমিনুর রহমান চা-বাগানের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়ার দক্ষিণ বল্লবপুরে। আর তাঁর বাবার চা-বাগানের ব্যবসা ছিল জলপাইগুড়িতে। বাবার ব্যবসার কারণে ফেনীর আমিনুর রহমানকে ওখানেই থাকতে হতো। তাই আনিসের জন্মও হয় সেখানেই। একটু বেশি দেরিতে দাঁত উঠেছিল বলে পরিবারের অনেকেই আনিসকে বুড়া বলে ডাকতেন। একসময় জলপাইগুড়ি ছেড়ে তার পরিবারকে গ্রামে চলে আসতে হয়। সেখানেই আনিসের পড়াশোনা শুরু। স্কুল জীবনে 'ড্রেস এজ ইউ লাইক' অনুষ্ঠানে তিনি নিজের মনের মতো করে সাজতেন। পুরস্কার হিসেবে পেতেন ৫০-৬০ টাকা। সেই টাকা স্কুলের পিয়নদের দিয়ে দিতেন তিনি। ১৯৬৫ সালে খালাতো বোন কুলসুম আরা বেগমকে ভালোবেসে বিয়ে করেন তিনি। ২০১৫ সালে ঈদুল আজহার তিনদিন আগে হঠাৎ করেই মৃত্যুবরণ করেন তাঁর স্ত্রী। অসময়ে স্ত্রীকে হারিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এই অভিনেতা। তারপর থেকে আর কখনো ক্যামেরার সামনে আসেননি তিনি।

চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ

ষাটের দশকের শুরুতেই ঢাকায় আসেন আনিস। সে সময় তার বড়ো ভাই লুৎফর রহমান এফডিসিতে চাকরি করতেন। বড়ো ভাই তাকে বিখ্যাত ফটোগ্রাফার সাঈদুর রহমানের স্টুডিওতে কাজ দিলেন। তিনি শুরু করলেন ফটোগ্রাফির কাজ। বড়ো ভাইয়ের অনুমতি নিয়ে তিনি এফডিসিতে সম্পাদনার চাকরি নিলেন। সেখানে পরিচয় হয় ক্যামেরাম্যান সাধন রায়ের সঙ্গে। তিনিই তাকে প্রথম উদয়ন চৌধুরীর 'বিষকন্যা' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ করে দেন। তার প্রথম সংলাপ 'আহ একটা কথা বুঝ না কেন নানি, ওই মাইয়া আমাগো ঘরে আইলে কপাল খুইলা যাইব'। কিন্তু ক্যামেরাম্যান পরিচালককে বললেন, 'এই মাল কোত্থেকে আনছেন, না আছে গলা, না চেহারা'। এই কথা শুনা মাত্র তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। পরবর্তীতে জিল্লুর রহিমের 'এইতো জীবন' চলচ্চিত্র দিয়ে শুরু হয় তার অভিনয় জীবন। ছবিটি ১৯৬৪ সালে মুক্তি পায়।

আনিস একাধারে চলচ্চিত্রাভিনেতা, রেডিও আর্টিস্ট এবং নাট্যাভিনেতা ছিলেন। তাকে টিভিতে অভিনয়ের সুযোগ করে দিয়েছিলেন কলিম শরাফী। আর রেডিওতে অভিনয় করার সুযোগ করে দেন খান আতাউর রহমান। তিনি এহতেশাম ও মুস্তাফিজের লিও দোসানী ফিল্মে সহকারী সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন। ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শতাধিক ছবিতে কৌতুকের মতো কঠিন অভিনয়টি সহজ ও সাবলীলভাবে করে অনবরত দর্শক হৃদয়কে নাড়া দিয়ে গেছেন তিনি। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নাটকে গোলাম হোসেন চরিত্রে অভিনয় করে তিনি মঞ্চে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি

এইতো জীবন, পয়সে, মালা, জরিনা সুন্দরী, জংলী মেয়ে, মধুমালা, ভানুমতি, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা, অশ্রু দিয়ে লেখা, পদ্মা নদীর মাঝি, সূর্য ওঠার আগে, অধিকার, অঙ্গার, বারুদ, ঘর সংসার, এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী, পুরস্কার, লাল কাগজ, নির্দোষ, সানাই, উজান ভাটি, তালাক ইত্যাদি।

লেখক: কপি রাইটার, ডিএফপি